অদ্ভুতুড়ে সিরিজ
গোলমেলে লোক
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
আনন্দ

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ
গোলমেলে লোক
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
আনন্দ

গোলমেলে লোক

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১০

ISBN 978-81–7756-879.()
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ কেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

উৎসর্গ
ডা. রামেন্দু হোমচৌধুরী
করকমলেষু

মদনপুরের হাটে মোট বত্রিশ টাকা পকেটমার হয়ে গেল গুরুপদর। গুরুপদ যখন নিশিকান্তর দোকানে গামছা দর করছিল, তখনই ঘটনা। একটা পাতলা চেহারার কমবয়সি লোক কিছুক্ষণ ধরেই তার আশপাশে ঘুরঘুর করছিল যেন। বোধ হয় তক্কে-তক্কেই ছিল। নিশিকান্তর দোকানে গামছা বাছাবাছি করার সময় সট করে পকেট ফাঁক করে দিয়ে সটকেছে। স্বীকার করতেই হবে যে, ছোকরার হাত খুব পরিষ্কার, গুরুপদর একটু সুড়সুড়ি অবধি লাগেনি। একটা মাছি ভনভন করে মুখে-চোখে বারবার বসছিল বলে সেই সময়টায় গুরুপদ একটু ব্যতিব্যস্ত ছিল বটে, সেই ফাঁকেই কাজ হাসিল করেছে। রাগ যে একটু হল না তা নয়। তবে কিনা গুরুপদ গুণীর কদর দিতেও জানে। পকেটমার লোকটার হাতটি চৌখস। গুরুপদ একসময় জাদুকর সাতকড়ি সরখেলের শাগরেদি করেছিল। হাতসাফাই মকশো করার জন্য কী খাটুনিটাই খাটতে হত! সাতকড়িবাবু বুড়ো বয়স অবধি সকালে উঠে দু'ঘণ্টা প্র্যাকটিস করতেন। যেমন বড় বড় গানাদাররা রেওয়াজ করে, তেমনি। তা পকেটমারিও সেইরকমই এক বিদ্যে। নিপুণ আঙুলের আলতো এবং সূক্ষ্ম কাজ! জাদুকর বা গানাদার বা বাজনদারের ভুলচুক হলে, আর যাই হোক, প্রাণের ভয় নেই। কিন্তু পকেটমারের ভুলচুক হলে হাটুরে ঠ্যাঙনি খেয়ে গঙ্গাযাত্রার দশা হতে পারে। তা যদি না-ও হয়, থানা-পুলিশ থেকে হাজতবাস, কী-ই না হতে পারে?

গামছা আর কেনা হল না গুরুপদর।

কথাটা হল, বিদ্যের কোনও শেষ নেই। যতই শেখো না কেন, আরও কত কী বাকি থেকে যায়! গুরুপদ বিদ্যে শিখতে বড় ভালবাসে। স্কুল-কলেজে তেমন সুবিধে করতে পারেনি বটে, কিন্তু বিদ্যে তার কিছু কম নেই। বিদ্যাধরমাঝির কাছে নৌকো বাইতে শিখেছিল, গদাইধীবরের কাছে খ্যাপলা জাল ফেলতে। সাপ ধরতে শিখিয়েছিল হবিবগঞ্জের বুড়ো সাপুড়ে নজর আলি। সাতকড়িবাবুর কাছে কিছুদিন নাড়া বেঁধে ম্যাজিক মকশো করল। শিবু মিশ্রের কাছে শিখল তবলা। মারণ-উচাটন শিখবে বলে বীরপুরের শ্মশানে তারাতান্ত্রিকের কাছেও কিছুদিন ধরনা দিতে হয়েছিল। পাশের বাড়ির সেলাইদিদিমণি শোভনাদির কাছে উলবোনা শিখতেও বাকি রেখেছে নাকি? হরেরাম ভট্টাচার্যের কাছে খালি জ্যোতিষী আর নবছা মণ্ডলের কাছে এক হোমিয়োপ্যাথিও শেখা আছে তার। এত সব শিখেও তার মনে হয়, আহা, আরও কিছু শিখলে হত! এই যেমন এখন হচ্ছে! পকেটমারি হওয়ার পর তার মন বলছে, এ বিদ্যেটাও কিছু ফ্যালনা নয়। কারও পকেট মেরে আখের গোছানোর মতলব নেই তার। কিন্তু বিদ্যেটা শিখে রাখা তো আর দোষের নয়!

মদনপুরের হাটের নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখে নটবর হাজরা। তার চা-মিষ্টির দোকান। ভারী তিরিক্ষি মেজাজের মানুষ। তবে কণ্ঠীতিলকধারী পরম বৈষ্ণব। তার দোকানে যাতায়াত নেই মদনপুরের তেমন হাটুরে খুঁজে পাওয়া শক্ত। চোর-

ছাচোড় থেকে দারোগা পুলিশ সকলেই পায়ের ধুলো নটবরের দোকানে পড়ে থাকে।

শীতে-গ্রীষ্মে নটবরের একটাই পোশাক। গায়ে হাতাওয়ালা একটা গেঞ্জি আর পরনে হেঁটো ধুতি। দোকানে গিজগিজ করছে খদ্দেরের ভিড়। নটবর ঝাঁঝরি হাতায় রস ঝেড়ে বোদে তুলে বারকোশে রাখছিল। তারই ফাঁকে পকেটমারির বৃত্তান্তটা শুনে একটা ফঁৎ করে শ্বাস ছেড়ে বলল, "ছ্যাঃ ছ্যাঃ, মাত্র বত্রিশ টাকা পকেটমারি হয়েছে বলে সাতকাহন করে বলতে এয়েছ! এ যে বড় ঘেন্নার কথা হল বাপু! পকেটমারের তো মেহনতেও পোষায়নি। বরং তাকে খুঁজে বের করে তার হাতে আরও শতখানেক টাকা গুজে দিয়ে মাপ চেয়ে নাও গে যাও!"

"সে রকমই হচ্ছে নটবরদাদা! আর সেই জন্যই তার তল্লাশে তোমার কাছে আসা।"

নটবর বিরস মুখে বিরক্ত হয়ে বলল, "শোনো কথা! পকেটমারের তল্লাশে বাবু এয়েছে আমার কাছে? কেন রে বাপু আমি কি চোর-চোট্টাদের ইজারা নিয়ে বসে আছি? কথাটা পাঁচকান হলে ভদ্রলোকেরা আর এ দোকানে পা দেবে ভেবেছ?"

তটস্থ হয়ে গুরুপদ বলল, "কথাটা ওভাবে বলা নয় নটবরদাদা। বলছিলাম কী, মদনপুরের হাটে এমন মানুষ নেই, যে তোমাকে খাতির করে না। কে কোন মতলবে ঘুরে বেড়ায় তা তোমার চেয়ে ভাল আর কে জানে?"

নটবর আড়চোখে চেয়ে বলল,"তা তাকে ধরতে পারলে কি থানা-পুলিশ করবে নাকি? তা হলে বাপু, আমি ওর মধ্যে নেই।"

জিভ কেটে গুরুপদ বলল, "আরে না না। থানা-পুলিশের কথাই উঠছে না। ছোকরার হাত বড্ড সাফ। তাই ভাবছিলাম, তাকে পেলে একটু পায়ের ধুলো নিতুম।"

নটবর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "ওসব গাঁটকাটা পকেটমারদের খবর বটু সর্দারের কাছে পাবে, আমার কাছে নয়। এখন বিদেয় হও।"

"কিন্তু দাদা, বটু সর্দারকে কোথায় পাওয়া যাবে?"

"তার আমি কী জানি! নামটা হাটের মধ্যে ছড়াতে ছড়াতে যাও, দ্যাখো যদি লেগে যায়।"

গুরুপদ বুঝল, নটবরের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি খবর আদায় হবে না। তা এই খবরটুকুও বড় কম নয়। বটু সর্দার তার লাইনের কেউকেটাই হবে। আর কেউকেটাকে খুঁজে বের করা খুব শক্ত নয়।

তবে মদনপুরের হাটে আহাম্মকেরও অভাব নেই। প্রথম যে লোকটাকে গুরুপদ পাকড়াও করল, তার বেশ রাঙামুলো চেহারা, নাদুসনুদুস, ঘাড়ে একটা বস্তা। বটু সর্দারের নাম শুনে একগাল হেসে বলল, "বটুক মুন্সিকে খুঁজছ তো? ওই তো বটতলায় বসে তোলার পয়সা গুনছেন। পরনে সবুজ চেক লুঙি, গায়ে হলুদরঙা ভাগলপুরি চাদর।"

দ্বিতীয় লোকটা সিড়িঙ্গে চেহারা। একটু বাবুগোছের। পরনে শান্তিপুরি ধুতি, গায়ে গরদের পাঞ্জাবি। নাক সিটকে বলল, "বটু সর্দার, দূর মশাই, এ তো কোনও ভদ্রলোকের নামই নয়।"

গুরুপদ ভারী বিনয়ের সঙ্গে বলল, "আজ্ঞে, ভদ্রলোক ননও। তবে গুণী লোক।"

লোকটা ভ্রূ কুচকে বলল, "গুণী লোক! মদনপুরের হাটে গুণী লোক ঘাপটি মেরে আছে আর আমি তার খবর জানি না? তা তোমার বটু সর্দারের গুণটা কীসের? ব্যায়ামবীর না মাদারি, হালুইকর না তবলচি, কবিয়াল না দাঁতের ডাক্তার?"

গুরুপদ থতমত খেয়ে বলল, "আজ্ঞে, সেটা ঠিক জানা নেই। তবে গুণী বলেই শোনা ছিল।"

"দুর দূর! শোনা কথায় কান দিয়ো না হে! মদনপুরের হাটে গুণী মানুষ সাকুল্যে তিনজন। হেয়ার কাটিং-এর ফটিক শীল, রসবড়ার কারিগর বিরিঞ্চিপদ পান্ডা আর গনতকার গণেশ গায়েন। বুঝলে?"

গুরুপদ ফাঁপড়ে পড়ল। বলতে নেই, মদনপুরের হাট আড়েদিঘে বিরাট চত্বর। হাজারও মানুষ গিজগিজ করছে। তল্লাটে এত জমজমাট হাট আর নেই। এখানে বটু সর্দারকে খুঁজে বের করা চাট্টিখানি কথা নয়।

"ছেলে হারিয়েছে বুঝি?" বলে ভুইফোড় একটা লোক ভারী হাসি-হাসি মুখ করে পথ আটকে দাঁড়িয়ে গেল। ছোকরা বয়স, পরনে কালো পাতলুন আর চকরাবকরা জামা, বাবরি চুল আর সরু গোফ।

গুরুপদ অবাক হয়ে বলল, "কেমন করে বুঝলেন?"

"ও আমরা মুখ দেখেই বুঝি। ফি হাটবারে এই মদনপুরে না হোক দশ-বিশটা ছেলে-মেয়ে হারায়। মেহনত করে আমরাই তাদের খুঁজে দিই কিনা! ওই তো আমাদের অফিসের সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে, 'সন্ধানী'। রেটও খুব সস্তা, ছেলেপ্রতি দু'শো টাকা। ছেলের নামধাম, বিবরণ লিখিয়ে একশো টাকা আগাম ফেলে রসিদ পকেটে পুরে নিশ্চিন্তে হাটবাজার করতে থাকুন। দুঘণ্টা বাদে আমাদের অফিসে এলেই ছেলে পেয়ে যাবেন।"

"বটে। বাঃ বাঃ, এ তো খুব ভাল ব্যবস্থা!"

"তা আপনার ছেলের নাম কী? বয়স কত? গায়ের রং? হাইট? কোথাও কাটা দাগ বা জড়ুল আছে কি?"

"ইয়ে, একটা মুশকিল হয়েছে।"

"কী মুশকিল মশাই?"

"আমিও একজনকে খুঁজছি বটে, তবে তার হাইট, বয়স বা জড়ুলের কথা জানা নেই কিনা!"

"সে কী মশাই? বাপ হয়ে নিজের ছেলের নাম জানেন না?"

"আহা, তা জানব না কেন? ছেলে হলে তবে তো নাম! আর ছেলে হওয়ার আগেও তো কিছু বখেরা থাকে, তাই না? তা আমার যে সেটাও হয়নি?"

"তার মানে?"

"এই বিয়ের কথাই বলছিলাম আর কী! আমার সেটাও হয়ে ওঠেনি কিনা!"

"আহা, সেটা আগে বলবেন তো! তা হলে আপনার হারিয়েছে কে?"

"তার নাম বটু সর্দার।"

"এই তো মুশকিলে ফেললেন। শুধু নাম দিয়ে কাউকে খুঁজে বের করা ডবল খাটুনির কাজ। ঠিক আছে, আগামটা দিয়ে যান, দেখছি।"

"ওটাও পেরে উঠছি না। একটু আগেই আমার পকেটমার হয়েছে।"

লোকটা কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "যত্ত সব!"

তারপর হনহন করে হেঁটে অন্যদিকে চলে গেল।

কয়েক পা হেঁটেই দাঁড়াতে হল গুরুপদকে। একটা প্রাণকাড়া গন্ধে ভারী উচাটন হয়ে উঠল সে। কাছেপিঠেই কোথায় যেন ফুলুরি-বেগুনি ভাজা হচ্ছে। তটস্থ হয়ে চারদিকে চেয়েই সে ভিড়টা দেখতে পেল। গন্ধটা যেন বাতাসকে একেবারে রসস্থ করে ফেলেছে। সম্মোহিতের মতো গিয়ে ভিড়ের পিছন দিকটায় দাঁড়িয়ে প্রাণভরে গন্ধটা নিল সে। পকেটে পয়সা না থাকলে দুঃখের জল যে কোথা থেকে কোথায় গড়াতে পারে, তা আজ হাড়ে-হাড়ে বুঝল সে। পণ্ডিতরা বলেছেন বটে যে, ঘ্রাণেই অর্ধেক ভোজন হয়ে যায়। কিন্তু গুরুপদর মনে হল, কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। এই তো সে গন্ধে গন্ধে বুকটা ঝাঁঝরা করে ফেলল, কিন্তু কই, পেটটা অর্ধেক ভরেছে বলে তো মনে হচ্ছে না! বরং খিদেটা বেশ চাগাড় দিয়েই উঠতে চাইছে।

"শিবপদ যে!" বলে গোলগাল, বেঁটে আহ্লাদি চেহারার একটা প্যান্ট আর ডোরাকাটা জামাপরা লোক ভারী হাসি হাসি মুখে তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

গুরুপদ বলল, "আমি শিবপদ নই।"

“নও? শিবপদর মতোই যেন লাগল!”

“আপনার চোখের ভুল।”

“তা হবে।” বলে লোকটা বিদেয় হল। কিন্তু একটু বাদেই চোখে ঘষাকাচের চশমা, পায়জামা আর হলুদ পাঞ্জাবি পরা খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা পাকানো চেহারার একটা লোক তার মুখে একটা জর্দা পানের শ্বাস ফেলে বলল, “নব নাকি রে?”

বিরক্ত গুরুপদ একটু রাগের গলায় বলল, “দিলেন তো অমন তেলেভাজার গন্ধটাকে জর্দার গন্ধ দিয়ে গুলিয়ে! আমি নব নই।”

“নও? তা আগে বলতে হয়!” বলে লোকটা ল্যাকপ্যাক করে চলে গেল।

তেলেভাজার খদ্দেরের ভিড় থেকে একটা ছিপছিপে ফরসামতো ছোকরা একটা শালপাতার ঠোঙা হাতে বেরিয়ে এসে তার দিকে চেয়ে বলল,"আরে মশাই, যান যান, তাড়াতাড়ি লাইনে ঢুকে পড়ুন। জিনিস শেষ হয়ে আসছে যে!"

গুরুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "না হে ভায়া, পকেটে পয়সা নেই।"

ছোকরা চটপটে পায়ে চলে যেতে যেতে বলল,"আহা, খুঁজে-পেতে দেখুন না, কত সময়ে পাওয়াও তো যায়!"

গুরুপদ বিমর্ষ হয়ে ছোকরার গমনপথের দিকে চেয়ে ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শূন্য পকেটে একটু হাত বোলাতে গেল। আর তখনই ভারী অবাক হয়ে টের পেল, তার বুকপকেটে ভাজকরা কাগজের মতো কী যেন। সঙ্গে দুটো চাকতিও যেন আঙুলে লাগল। পকেট থেকে জিনিসগুলো বের করে তার মুখ একগাল মাছি। তিনটে দশ টাকার নোট আর দুটো এক টাকার কয়েন! মোট বত্রিশ টাকা! এই টাকাই তো ছিল তার পকেটে? কখন, কীভাবে ফেরত এল রে বাবা? এরকমও কি হয় নাকি? গুরুপদ হাঁ করে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। তা হলে কি তার আদৌ পকেটমার হয়নি?

কিন্তু তাই বা কী করে হয়? টাকাটা তার বুকপকেটেই ছিল বটে, কিন্তু গত ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে অন্তত বাইশবার তার জামার তিনটে পকেটই তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। এমন তো নয় যে, টাকাগুলো একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছে!

হঠাৎ বাঘ-ডাকা একখানা কণ্ঠস্বর তার কান ঘেষেই গর্জন করে উঠল, "পথ হারিয়ে ফেলেছিস রে দুরাত্মা? সংসারের পেজরাপোলে ঘুরে ঘুরে মরছিস রে মায়াবদ্ধ জীব? এখনও পথের সন্ধান পেলি না রে পাপী? এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হা করে শুধু ভেবে যাচ্ছিস; ওরে, চলতে শুরু কর, চলতে শুরু কর! আর দেরি করিসনি। সময় যে কচুপাতায় বৃষ্টির ফোটা রে! কেতরে পড়েছিস কি গড়িয়ে গেলি!"

গুরুপদ সবিস্ময়ে দেখল, সামনে দাড়ি-গোঁফওয়ালা, জটাজুটধারী, রক্তাম্বর পরা পেল্লায় চেহারার এক সাধু দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একখানা বিভীষণ চেহারার সিঁদুর লেপটানো শূল আর কমণ্ডলু। দেখলে ভয়-ভক্তি দুটোই হওয়ার কথা। কিন্তু গুরুপদর মাথায় অবাক ভাবটা এখনও রয়েছে বলে কোনওটাই তেমন হল না। তবে একটু সচকিত হয়ে বলল, "পথ হারিয়ে ফেলিনি তো বাবাজি, তবে পথ একটা খুঁজছি বটে।"

সাধু হুংকার দিয়ে বলল, "পথ খুঁজবি কী রে? তোর সামনেই তো সোজাপথ এগিয়ে যা, এগিয়ে যা! পঞ্চাশ কদম এগোলেই দেখবি, তোর অভীষ্ট ঘাপটি মেরে বসে আছে। ভাল চাস তো আর গোলকধাঁধায় ঘুরিস না। সাধুসেবায় দশটা টাকা ফেলে দিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে এগিয়ে চল দেখি!"

ভারী ধন্ধে পড়ে গেল গুরুপদ। সাধুটা ভণ্ড কি না কে জানে? তবে কথার মধ্যে একটা সংকেত নেই তো? সোজা পঞ্চাশ পা এগোলেই কি বটু সর্দারের ঠেক? কে

জানে, হতেও তো পারে।

সে পকেট থেকে দোনোমোনো করে একটা দশ টাকার নোট বের করেছে কি করেনি, সাধুবাবা সট করে এমন কায়দায় সেটা তুলে নিল যে, গুরুপদ প্রায় টেরই পেল না! মনে হল, নোটটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

সাধু তেমনি সপ্তমে গলা তুলে বলল, "যা ব্যাটা যা! তোর মুক্তিই হয়ে গেল ধরে নে।"

সাধু বিদেয় হলে গুরুপদ ভিড় ঠেলে গুনে গুনে পঞ্চাশ পা এগিয়ে গেল। কিন্তু সমস্যার কোনও সুরাহা হল না। বাঁ ধারে একটা কাচের চুড়ির দোকানে রাজ্যের মেয়ের ভিড়। ডান ধারে পাইকারি সবজিবাজারের চেঁচামেচি। এই হট্টমেলায় কোথায় বটু সর্দারকে পাওয়া যাবে?

তবে পঞ্চাশ পা কথাটাও একটু গোলমেলে। সকলের পা তো সমান মাপের নয়। কেউ লম্বা পায়ে হাটে, কেউ গুটিগুটি। আর পঞ্চাশ বললেই কি আর টায়েটিকে পঞ্চাশ! দু-চার পা এদিক-ওদিক হতেই পারে। তাই সে একটু এগিয়ে এবং একটু পিছিয়ে বারকয়েক চারদিকটা জরিপ করল। তেমন সুবিধে হল না। সামনে হাওয়া-বন্দুকের দোকানে বেলুন ফাটানোর হুড়োহুড়ি, কাঠিবরফওয়ালার হাঁকডাক, আর পিছনে খোলভুসির আড়ত আর ছাপাশাড়ির স্টল। রহস্যময় কিছুই নেই।

কোনও কাজ আটকে গেলে গুরুপদর বড় অসোয়াস্তি হয়। তাই সে একটু হতাশ আর একটু ভাবিত হয়ে চারদিকে টালুমালু করে চাইছিল। হঠাৎ লুঙি আর ফতুয়াপরা রোগামতো ধূর্ত চেহারার একটা লোক তার পথ আটকে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বলল, "তোমার মতলবখানা কী বলো তো বাপুঃ অ্যা! মতলখানা কী?"

গুরুপদ তটস্থ হয়ে বলল, "আজ্ঞে, মতলব কিছু নেই। চারদিকটা দেখছি আর কী!"

"উহু। অত সোজা মানুষ বলে তো তোমাকে মনে হচ্ছে না! গতিবিধি অত্যন্ত সন্দেহজনক! একবার এগোচ্ছ, একবার পিছোচ্ছ। চোখ চরকির মতো চারদিকে ঘুরছে। শিয়ালের মতো হাবভাব। তুমি তো মোটেই সুবিধের লোক নও বাপু! অনেকক্ষণ ধরে আড়েআড়ে তোমাকে চোখে চোখে রেখেছি। আসল কথাটা খুলে বলো তো বাপু! তুমি নির্ঘাত বেজা মল্লিকের চর!"

গুরুপদর মুখ একগাল মাছি। কস্মিনকালে বেজা মল্লিকের নাম শোনেনি। অবাক হয়ে বলল, "বেজা মল্লিক কে মশাই?"

লোকটা একটুমিচকে শয়তানি হাসি হেসে বলল, "আর ভালমানুষ সাজতে হবে না হে! তোমাকে দেখেই চিনেছি। এই মনোময় মান্নার চোখে ধুলো দেবে তেমন শর্মা এখনও জন্মায়নি, বুঝলে?"

গুরুপদ ভয় খেয়ে কাচুমাচু হয়ে বলল, "এ তো বড় মুশকিলেই পড়া গেল মশাই! আমি হলুম গে গোপালহাটির গুরুপদ রায়। কস্মিনকালেও বেজা মল্লিক নামে কাউকে চিনি না। কেন ঝুটমুট ঝামেলা করছেন বলুন তো?"

"ঝামেলার এখনই কী দেখলে? সোজা কথায় যে কাজ হবে না তা আমি আগেই জানতুম। তাই আমার শাগরেদরাও তৈরি হয়ে আছে। একডাকে লহমায় এসে ঘিরে ফেলবে। ঝামেলা তো শুরু হবে তখন।"

গুরুপদ একেবারে অকুলপাথারে পড়ে গেল। জল যে এতদূর গড়াবে কে জানত? শুকনো গলায় সে বিড়বিড় করে বলল, "বটু সর্দারের খোঁজ করতে এসে তো আচ্ছা বিপদেই পড়া গেল দেখছি!"

মনোময় মান্না যেন হঠাৎ ছ্যাকা খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। চোখ গোল গোল করে তার দিকে চেয়ে বলল, "কে? কার নাম বললে হে?"

"সে আপনি চিনবেন না। নমস্য লোক। তার নাম বটু সর্দার।"

সটান দাড়িয়ে ছিল মনোময়। এবার হঠাৎ যেন হাঁটু ভেঙে, কোমর ভাঁজ হয়ে একেবারে দ' হয়ে গেল। গ্যালগ্যালে হেসে গদগদ গলায় বলে উঠল, "বটু সর্দার! ওরে বাবা, আগে বলবে তো! ছিঃ ছিঃ, দ্যাখোদিকি কাণ্ড! কিছু মনে কোরো না বাপু, বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছিল!"

গুরুপদ ভদ্রতা করে বলল, "না না, তাতে কী হয়েছে? ভুল তো মানুষের হতেই পারে।"

মনোময় ভারী আপ্যায়িত হয়ে দু'হাত কচলে নরম গলায় বলল, "তা বাপু, তুমি যখন বটু সর্দারের লোক, তখন আমার একটা উপকার করে দিতেই হবে।"

মনোময় একটু হেঃ হেঃ করে নিয়ে বলল, "আমার ভাইপোটা পাশটাস করে বসে আছে, কিন্তু কাজকর্মে তেমন সুবিধে করে উঠতে পারছে না। তার খুব ইচ্ছে, বটু সর্দারের আখড়ায় গিয়ে একটু হাতের কাজ শিখে রোজগারে নেমে পড়ে। তা বটুর আখড়ায় তো শুনি বিদ্যের সমুদ্দুর। পকেটমারি, ছিনতাই, কেপমারি, চুরি, ডাকাতি, তোলাবাজি, ভাড়াটে খুন, কিডন্যাপিং, সবই শেখানো হয়। ওখান থেকে যারা পাশটাস করে বেরোয় তারা কেউ বসে নেই। কিন্তু বটুর আখড়ায় ঢোকা বড় শক্ত। অ্যাডমিশন টেস্ট আছে, ফিজিক্যাল ফিটনেস আছে, আই কিউ পরীক্ষা আছে। তা দেবে বাপু একটা ব্যবস্থা করে? বড্ড উপকার হয় তা হলে। এই তো কাছেই মগরাহাটিতে তার ঠেক, বড়জোর মাইলটাক হবে। বলো তো তোমার সঙ্গে গিয়ে আজই পাকা কথা সেরে আগাম দিয়ে যাই?"

গুরুপদ একটু থতমত খেয়ে গেল। এত ব্যাপার তো তার জানা ছিল না। তবে চট করে সামলে নিয়ে বলল, "সেই উপায় নেই মশাই। আমি এখন ডিউটিতে আছি।"

খপ করে তার হাত দু'খানা ধরে মনোময় বলল, "আমার ভাইপোটার একটা ব্যবস্থা তোমাকে করে দিতেই হবে বাপু। তার ঝোকটা তোলাবাজির দিকেই। দিব্যি ভাল ব্যাবসা। এক পয়সা লগ্নি নেই, টহল দিয়ে বেড়াও আর টাকা তোলো।"

শুনে গুরুপদর ভিরমি খাওয়ার জোগাড়! সে আমতা-আমতা করে বলল, "হ্যাঁ, তাই বা মন্দ কী? তবে আপনার নিজের ভাইপো বলেই বলছি, ওসব লাইনে ভাইপোকে নামানো কি ভাল?"

মনোময় চোখ কপালে তুলে বলল, “ভাল নয় মানে? বটু সর্দারের নাম তো লোকের মুখে-মুখে। এই তো নিশিগঞ্জের গোপাল দাস মাত্র দু’বছর আগে পাশ করে বেরিয়ে কুঁড়েঘর ভেঙে রাতারাতি তিনতলা বাড়ি তুলে ফেলল। ছিনতাইয়ের হাত এত ভাল, গলার হার বা কানের দুল এমন কায়দায় তুলে নেবে যে, কেউ টেরটিও পাবে না। নসিপুরে হাবু গুন্ডার কথাই ধরো না কেন। শুধু মস্তানি করে কোন মন্ত্রীর শাগরেদ হয়ে এখন লাখ টাকা কামাচ্ছে। বিদ্যাপুরের ফেন্টুকে চেনো? গাঁট আর পকেট কেটে তার এখন মারুতি গাড়ি। পিরতলার ভৈরব মণ্ডলের নাম তো খুব শুনে থাকবে। চারটে ব্যাংক লুট করে এত টাকা হাতে এল যে, রাখার জায়গা নেই। শেষে দুধেল গোরুটা বেচে দিয়ে গোয়ালঘরে গাদা করে টাকা রাখতে হয়েছে।”

গুরুপদর চোখ গোল থেকে আরও গোল হচ্ছিল। বটু সর্দারের তালিমের যে এত গুণ তা কে জানত? সে এক পা দু পা করে পিছু হটছিল। আমতা-আমতা করে বলল, “তা বটে। তবে কিনা...!”

মনোময় খুব আপ্যায়নের হাসি হেসে বলল, “অবিশ্যি তোমাকে এসব বলার মানেই হয় না। এ যেন মায়ের কাছে মাসির গপ্পো। তুমি নিজেই তো বটু সর্দারের নিজের হাতে তৈরি জিনিস! তা বাপু, তোমার হাতযশটা কীসে বলো তো?”

গুরুপদ ঘাবড়ে গেলেও কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, “সে বলার মতো কিছু নয়। ওই একটু-আধটু হাতের কাজ শিখেছি আর কী।”

“আহা, তোমার বিনয়ের ভাবখানা দেখে বড় ভাল লাগল বাপু! নিজের গুণের কথা কি আর নিজের মুখে ফেদে বলা যায়? তবে তোমাকে দেখেই কিন্তু ঠিক চিনে নিয়েছি। একটু হাবাগোবা ভালমানুষের মতো চেহারাখানা বটে, কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারোনি। ভাব দেখেই মনে হয়েছিল, এ একেবারে তৈরি জিনিস। হেঃ হেঃ, ঠিক কি না?”

গুরুপদ একটু আঁতকে উঠে আর্তনাদের গলায় বলল, “আজ্ঞে, না না, অতটা নয়।”

মনোময় ভারী আহ্লাদের গলায় বলল, “না বললে শুনছে কে হে? দাঁড়াও, অত বড় মানুষের চেলা তুমি, পাঁচজনকে ডেকে একটু দেখাই। সবাই চিনে রাখুক তোমাকে।”

বলেই মনোময় পিছু ফিরে টারজানের মতো মুখের দু’পাশে দু’ হাত চোঙার মতো করে, “ওরে শিবু, ও ষষ্ঠীপদ, ওরে মাস্তু, ট্যাপা, গিরিজা, ধেয়ে আয় রে, ছুট্টে আয়। দেখে যা কাকে পাকড়াও করেছি…!”

ষন্ডা চেহারার ছ’-সাতজন ছেলে-ছোকরা ধেয়ে-পেয়ে আসছিল।

গুরুপদ ঠিক বুঝতে পারছিল না, ব্যাপারটা কী হচ্ছে? ঠিক এই সময় তার ডান হাতে একটা হ্যাচকা টান পড়ল। কে যেন তাকে প্রায় হিচড়ে নিয়ে যেতে-যেতে বলল, “পালাও ! পালাও!”

হাটের গিজগিজে ভিড়ের ভিতর দিয়ে দিব্যি ফাঁক-ফোকর গলে একটা মাঝবয়সি লোক তার নড়া ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গুরুপদ একবার "করেন কী ! করেন কী!" বলে আপত্তি জানিয়েছিল বটে ! কিন্তু লোকটা একটা ধমক দিয়ে বলল, "চুপচাপ ছুটতে থাকো। কোনও কথা নয়।" পিছনে কারা যেন রে রে করে তেড়ে আসছে বলেও টের পেল সে। গুরুপদর আর আপত্তি হল না।

লোকটা লহমায় তাকে দু' সার দোকানঘর পেরিয়ে একটা খড়ের গাদার পিছনে এনে দাঁড় করাল। গুরুপদ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "এটা কী হল?"

লোকটার পরনে একটা মালকোঁচা মারা আঁট করে পরা হেঁটো ধুতি, গায়ে একটা মেটে রঙের ফতুয়া। মাথায় ছোট করে ছাটা কাঁচাপাকা চুল, ভুড়ো গোফ আর গালে খোচা-খোচা দাড়ি। বেশ হাড়ে-মাসে পোক্ত চেহারা। জুলজুল করে তার দিকে চেয়ে ছিল। ভারী অবাক গলায় বলল, "কিছু খারাপ করলুম নাকি?"

গুরুপদ বলল, "খারাপ করলেন না? একটা লোকের সঙ্গে দুটো কাজের কথা হচ্ছিল, কোথা থেকে চেনা নেই, জানা নেই, বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ এসে নড়া ধরে হ্যাচক টান মেরে হিড়হিড় করে টেনে আনলেন যে বড়? কাজটা কি ভাল হল মশাই?"

লোকটা মিনমিন করে বলল,"আহা, অত ভেবেচিন্তে কি কাজ করা যায়? আমার বাপু মাথাটা আজকাল তেমন খেলে না। হঠাৎ তোমাকে ওই লোকটার সঙ্গে দেখে মনে হল, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা তোমার ঠিক হচ্ছে না। তাই একটু টানা-হ্যাচড়া করতে হল বাপু কিছু মনে কোরো না।"

"তা হঠাৎ ওরকম কাণ্ড করার ইচ্ছে হল কেন আপনার? পাগল নাকি আপনি?"

লোকটা মাথা চুলকে ভারী ভাবিত হয়ে বলল, "তা আছি বোধ হয় একটু।"

"ওই লোকটাকে কি আপনি চেনেন?"

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "না হে বাপু, আজকাল চোখেই কি তেমন দেখি? তিন কুড়ি বয়স পুরতে চলল যে! এখন সব কিছু তেমন ঠিকঠাক ঠাহর হয় না, বুঝলে! তবে আবছা যেন মনো মান্না বলে মনে হচ্ছিল। না-ও হতে পারে। একরকম দেখতে দুটো লোকও তো হয়। আকছারই হচ্ছে।"

"আপনি ঠিকই দেখেছেন। লোকটা মনোময় মান্নাই বটে। তা লোকটা কেমন? পাজি লোক নাকি?" "

ওই দ্যাখো! তাই কি বললুম?"

"মানেটা তো সেরকমই দাঁড়াচ্ছে।"

"ওরে না না, পাজি লোক হতে যাবে কোন দুঃখে? সত্যি কথা বলতে কী বাপু, আজকাল আর আমি একটাও পাজি লোক দেখতে পাই না। আগে দু-চারটে চোখে পড়ত বটে। কিন্তু এখন আর তাদের তেমন দেখছি না তো! আচ্ছা, পাজি লোকগুলো সব গেল কোথায় বলতে পারো?"

"পাজি লোকের অভাব কী? চারদিকে তারাই তো গিজগিজ করছে! এই যে আপনি, তা আপনিই কী আর ভাল লোক? নড়া ধরে এমন হ্যাচকা টান মেরেছিলেন যে, বগল অবধি টাটাচ্ছে।"

লোকটা তেমনি জুলজুলে ভিতু চোখে চেয়ে আমতা আমতা করে বলল, "তা অবিশ্যি ঠিক। আমি তেমন সুবিধের লোক নইও।"

"পাজি লোকের কথা আরও শুনবেন? এই একটু আগেই এই হাটে গামছা দর করার সময় আমার বত্রিশটা টাকা দিনে-দুপুরে পকেটমার হয়েছে। তবু বলবেন দুনিয়ায় পাজি লোক নেই?"

লোকটা চোখ কপালে তুলে বলল, "পকেটমার হয়েছে? বলো কী? এ তো সর্ব্বেবানেশে কথা!"

"আর সেই পকেটমার নাকি বটু সর্দারের লোক। আর বটু সর্দারের আখড়ায় নাকি ডজন-ডজন চোর, ডাকাত, পকেটমার, ছিনতাই আর তোলাবাজ তৈরি হচ্ছে। তবু পাজি লোক চোখে পড়ছে না আপনার?"

লোকটা ভারী আতান্তরে পড়ে চোখ মিটমিট করে বলল, "ওই তো বললাম, আমার চোখ দুটোই গিয়েছে। আজকাল আর ভালমন্দ তেমন ঠাহর পাই না। তবে বাপু, সত্যিকথা বলতে কী, মন্দ যেমন আছে তেমনি ভালও কি আর নেই? যেমন ধরো, পকেটমার হয়তো কারও টাকা পকেট মারল, আবার তারপর হয়তো সেই টাকা ফেরতও দিয়ে দিল। এমন কি আর হয় না? হতেই পারে। ঠিক কিনা বলো?"

"খুব ঠিক! কিন্তু সেকথা আপনি জানলেন কী করে? পকেটমার যে আমার টাকা ফেরত দিয়েছে, সেকথা তো পকেটমার ছাড়া আর কারও জানার কথা নয়।"

লোকটা বড় বড় চোখে চেয়ে ভারী অবাক হয়ে বলল, "ফেরত দিয়েছে? বলো কী হে? তা হলে কি সত্যযুগ এসে পড়ল নাকি?"

"আপনি কিন্তু কথা ঘোরাচ্ছেন।"

লোকটা সবেগে মাথা নাড়া দিয়ে বলল, "ওরে না রে বাবা, না। মেরেকেটে দশ-বারোটা বাকি সম্বল করে এই তিনকুড়ি বয়স পার করলুম। কথাই জানি না মোটে, তা তার আবার ঘোরপ্যাঁচ। পেটে বিদ্যে থাকলে তো কথার মারপ্যাঁচ শিখব রে বাপু! ওই লেখাপড়া জানা বাবুরা কথা দিয়ে বাঘ-সিংগি মারে, আমাদের কি সে জোর আছে?"

"বুঝলুম! আপনি আর ভেঙে বলবেন না তো? তা হলে আমাকেই বলতে হচ্ছে। আমার পকেট কে মেরেছিল জানেন? সে হল...!"

"ওরে চুপ! চুপ! অমন হেঁকে কি ওসব কথা কইতে আছে? মনো মান্না দলবল নিয়ে ঘুরছে যে! কথাটা কানে গেলেই ফস করে এসে হাতে হাতকড়া পরিয়ে থানায় টেনে নিয়ে যাবে।"

গুরুপদ অবাক হয়ে বলল, "মনোময় মান্না কি পুলিশের লোক নাকি মশাই?"

লোকটা মাথা চুলকে বলল, "সেরকমই তো শুনি। শোনার ভুলও হতে পারে।"

"বুঝেছি।"

লোকটা ফের জুলজুল করে তার দিকে চেয়ে বলল,"তাই বলছিলুম বাপু, টাকাটা যখন ফেরত পেয়েই গিয়েছ, তখন আর দেরি না করে বাড়িমুখে রওনা হয়ে পড়ো। বেলাও পড়ে এল। সন্ধের পর আমি আবার পথঘাট মোটেই ঠাহর করতে পারি না। মগরাহাটি তো আর চাট্টিখানি পথ নয়!"

"মগরাহাটি? আপনি কি মগরাহাটির লোক?"

"তিনকুড়ি বছর ধরে তাই তো জেনে আসছি!"

"তা হলে তো বটু সর্দারকে নিশ্চয়ই চেনেন? তার আখড়া যে ওখানেই?"

"হতে পারে! মগরাহাটি বিরাট জায়গা, মেলা লোকের বাস। আমি কি আর সবাইকে চিনে বসে আছি নাকি?"

"শুনেছি, সেখানে তার বিরাট আখড়া! গন্ডায়-গন্ডায় চোরডাকাত, পকেটমার, তোলাবাজ তৈরি হচ্ছে।"

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপনমনে বিড়বিড় করে বলল, "সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই।"

"কিছু বললেন?"

"না, এই বলছিলুম যে, বটু সর্দারের সঙ্গে তোমার দরকারটা কীসের?"

"দরকার তেমন কিছু নয়। শুনেছি গুণী মানুষ, একটু পায়ের ধুলো নিয়ে যেতুম।"

"আহা, তার জন্য অত দুরে যাওয়ার দরকার কী? এখানেই সেরে ফেললে হয়!"

গুরুপদ হা করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভারী অবাক গলায় বলল, "আপনিই বটু সর্দার নাকি? তা আপনাকে তো তেমন সাংঘাতিক লোক বলে মনে হচ্ছে না? দেখে তো ভয়ই লাগছে না মশাই!"

লোকটা একটু জড়সড় হয়ে বলল, "তা কেমন বটু সর্দার তোমার চাই বলো তো?"

গুরুপদ একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "আহা, শত হলেও বটু সর্দার একজন ডাকসাইটে লোক তো, হাকে-ডাকে-প্রতাপে লহমায় চেনা যাবে, তবে না!"

লোকটা মাথা নেড়ে দুঃখের সঙ্গে বলল, "না বাপু, আমার কাছে তেমন বটু সর্দার নেই।"

একটু নাক সিটকে গুরুপদ বলল, "তা আপনাকে তেমন ভক্তিছেদা হচ্ছে না বটে, তবে মানতে হবে যে, আপনার এলেম আছে। টাকাটা এমন মোলায়েম হাতে তুলে নিয়েছিলেন যে, টেরটাও পাইনি। কিন্তু কথাটা হল, টাকাটা ফের ফেরত দিলেন কেন?"

বটু সর্দার উদাস মুখ করে বলল, "টাকা দিয়ে আমার হবেটা কী? আমারটা খাবে কে? তিনকুলে কেউ নেই, চেলাচামুণ্ডা যারা ছিল তারাও লায়েক হয়ে যে যার ধান্দায় নেমে পড়েছে।"

গুরুপদ তাজ্জব হয়ে বলল, "তবে পকেট মারলেন কেন?"

"অভ্যেস রাখতে হয়, অভ্যেস রাখতে হয়। নইলে যে আঙুলে মরচে পড়ে যাবে।"

গুরুপদ একটু দোনোমোনো করে বলল, "পকেটমারিটা আমারও একটু শেখার ইচ্ছে ছিল মশাই! না হয় আপনার কাছেই শিখতাম !"

বটু সর্দার বিরস মুখে ঘনঘন মাথা নাড়া দিয়ে বলল, "সে উপায় নেই হে। আমার ডঙ্কা বেজে গিয়েছে।"

"তার মানে?"

"আজ, কাল বা পরশুর মধ্যেই আমার খুন হয়ে যাওয়ার কথা। দু-একদিন এদিক-ওদিক হতে পারে।"

"সে কী! কে খুন করবে আপনাকে?"

"সেইটেই ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারছি না। দু-দু'বার তাদের তাক ফসকেছে। তিনবারের বার বড় একটা ফসকায় না।"

উৎকণ্ঠিত গুরুপদ বলল, "তা আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন না কেন?"

"পালানোও কি চাট্টিখানি কথা? মাথা গোঁজার জায়গা দেবে কে? আর দিলেও কি রেহাই আছে বাপু? তারা ঠিক খুঁজে বের করবে।"

"তা হলে পুলিশের কাছে যান।"

বটু সর্দার করুণ একটু হেসে বলল, "তারাও ফাঁসিতে ঝোলাবে বলে ওত পেতে আছে যে! জেলখানায় মরা আমার তেমন পছন্দ নয় বাপু তার চেয়ে মাঠেঘাটে মরা অনেক ভাল। মরতে মরতেও হয়তো আকাশ-টাকাশ দেখা যাবে, একটু পাখির ডাকও কানে আসবে। চাই কি একটু ফুরফুরে বাতাসও এসে লাগবে গায়ে। কী বলো?"

"না না, ওটা কোনও কাজের কথা নয়। আপনি লোকটা হয়তো তেমন ভাল নন। কিন্তু গুণী লোক তো! এরকম বেঘোরে মরতে দেওয়া যায় না। চলুন, আমাদের বাড়িতে চলুন। আমাদের বাড়িতে মেলা লোক। সেখানে ভয় নেই।"

"পাগল নাকি! আমাকে নিয়ে শেষে বিপদে পড়বে বাপু।"

"হোক বিপদ। আমি ছাড়ছি না আপনাকে।"

দুই

কখনও ছাঁকনি জাল, কখনও ফাদি জালে রোজ এই সন্ধেবেলাটায় খালে মাছ ধরে লখাই। বেশিরভাগই চুনোপুঁটি। খালুই মাঝামাঝি ভরে গেলেই উঠে আসে। গোপালহাটির কুমোরপাড়ার খালধার বড় ভাল জায়গা নয়। কাছেপিঠে লোকবসতি নেই। চারদিক বড়বড় গাছের ছায়ায় হাকুচ অন্ধকার। বুক সমান আগাছায় চারদিক ছেয়ে আছে। তবে ভয় খেলে তো গরিবের চলে না।

আজ একটু দেরিই হয়ে গেল লখাইয়ের। অন্ধকারটা বেশ গাঢ়িয়ে গিয়েছে। শেষ দিকটায় একটা মাছের ঝাক চলে আসায় লখাই উঠে আসতে পারছিল না। খালুই আজ প্রায় ভরাভর্তি। লখাই ভারী খুশি। আজ যাহোক দুটো পয়সা আসবে হাতে।

তা এই খালধারে যাতায়াতের পথে লখাইয়ের সঙ্গে অনেকেরই দেখা হয়। শিয়াল, সাপ, বেজি, ভাম, বাদুড়। একদিন তেনাদের একজনের সঙ্গেও দেখা হয়ে গিয়েছিল। তেড়ে ঝড়জল হচ্ছিল সেদিন। আকাশও ঘনঘন ঝিলিক মারছিল। ওই অশ্বথ গাছটার তলায় একটা ঝিলিকের আলোয় দেখল, লম্বামতো কে একজন দাড়িয়ে আছে। দু'খানা ভীমলোচনে যেন লখাইয়ের দিকেই চেয়ে। ভয়ে রামনামটা অবধি ভুলে মেরে দিয়েছিল সেদিন। হাত-পায়ে সাড় ছিল না। চিড়বিড় করে কেবল বলছিল, "আরে, ওই যে কার যেন ছেলে, কী যেন নাম? আরে ওই তো বনবাসে গিয়েছিল যে লোকটা? ধুত্তোর, ওই যে হরধনু ভাঙল না! কী মুশকিল! নামটা যে পেটে আসছে, মুখে আসতে চাইছে না... দ্যাখো তো কাণ্ড...!"

একটু দূর থেকে একটা মোলায়েম খোনা গলা বলে উঠল, "আহা, রামনামের কথা ভাবছ তো? তা রামনাম তো ভাল জিনিস। কষে রামনাম করো তো হে, একটু শুনি।"

লখাই মহা ফাপড়ে পড়ে গেল। ভূত যদি নিজেই রামনাম করে, তা হলে তো বড়ই মুশকিল! কাজকারবার চলবে কী করে? আতঙ্কে রামনাম ভুলে লখাই আ আ করে প্রাণপণে আর্তনাদ করে উঠেছিল। লম্বা ভূতটা তখন "আ মোলো যা, এ যে মুছে যায়!" বলে ভারী বিরক্ত হয়ে ফুস করে বাতাসে আর অন্ধকারে মিশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দিনসাতেক পরের কথা! সন্ধের মুখে মাছটাছ ধরে লখাই খাল থেকে ভেজা গায়ে উঠে সবে গুটিগুটি বাড়ির পথ ধরেছে, ফের সেই অশ্বখ গাছের তলায় বুঝকো আঁধারে সেই লম্বা ভূতকে দাঁড়ানো দেখতে পেল। লখাই "ওরে বাবা রে! ভূত..ভূত..." বলে চেঁচিয়ে ছুটতে গিয়ে গাছের শিকড়ে পা আটকে পড়ে কুমড়োগড়াগড়ি। হাঁচোড় পাঁচোড় করে উঠতে গিয়ে সে হিঁঃ হিঁঃ হিঁঃ হিঁঃ' করে রক্ত জল করা ভুতুড়ে হাসিটাও শুনতে পেল। লখাই ভেবে নিল, আজ আর রক্ষে নেই! সে হার্ট ফেল হয়ে মরেই যাবে বুঝি! হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছিল। দম নিতে

আকুপাকু করছিল সে। হাওয়ায় একটা লাট খেয়ে লম্বা ভূতটা শূন্যে একটু ঝুলে থেকে বলল, “ওরে, এখানে আমিও এককালে মাছ ধরতাম কিনা!”

তবে ভেবে দেখলে ভয় পাওয়ারও একটা শেষ আছে। প্রায়ই ভয় খাওয়ার ব্যাপার হতে থাকলে ভয়টাও ক্ষয় হতে থাকে। কারণ, মাঝেমধ্যেই লম্বা ভূতটা হানা দিতে থাকায় লখাইয়ের ভয়টা ঘষা খেতে-খেতে একেবারে এইটুকুন হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে ঢাঙা ভূতের সঙ্গে তার একটু-আধটু কথা চালাচালিও শুরু হয়। এই যেমন ঢাঙাভূত একদিন জিজ্ঞেস করল, “তোর নাম কী রে?”

“লখাই। তোমার?”

“আমি হলুম বগা।”

“এই খালধারেই তোমার বাড়ি বুঝি?”

“আরে না! একশো বছর আগে গোঁসাইপাড়ায় আমাদের দুখানা কুঁড়েঘর ছিল বটে, সেসব আর নেই। ওই যে বললুম, এই খালে রোজ বিকেলে আমিও মাছ ধরতুম। তারপর দিল একদিন মা মনসার বাহন ঠুকে। কেউটে!”

“আহা রে!”

“মরে গিয়ে দুঃখ আমারও হয়েছিল। তখন আমার কতই বা বয়স? এই তোমার মতোই হবে। বড়জোর কুড়ি-বাইশ। রাগের চোটে আমি সাপটার উপর চড়াও হলুম। তার গর্তে গিয়ে ঢুকে গলা চেপে ধরে বললাম, ল্যাজে একটু পা পড়েছে বলেই কামড়াবি হতচ্ছাড়া? আমার খালুইভরা মাছ পড়ে রইল। ট্যাকে বারো গন্ডা পয়সা পড়ে রইল, আমার বুড়ি মা হা করে দাওয়ায় বসে রইল, কোন আক্কেলে বিষ ঢাললি রে বদমাশ? তা দেখলুম, সাপটা বাংলা কথা একদম বুঝতে পারল না। শুধু ফোঁসফাস করতে লাগল। বিশেষ পাত্তা দিল না।”

সেবার বর্ষার সময় খাল-বিল একাকার হওয়ায় বড় গাং থেকে খালে কামট ঢুকে পড়েছিল। লখাই তখন কোমরজলে নেমে মাছ ধরছে, ঠিক সেই সময় পিছন থেকে “লখাই, কামট! কামট! উঠে আয়।” বলে বগা চেঁচিয়ে হুশিয়ার করে দেওয়ায় অল্পের জন্য বেঁচে যায় লখাই। নইলে কামটটা তার পেটের মাংস প্রায় খুবলেই নিয়েছিল আর কী! তো তার পর থেকে বগার সঙ্গে তার দিব্যি ভাবসাব হয়ে যায়। মাঝে-মাঝে পাশাপাশি বসে দু’জনে সুখদুঃখের কথাও কয়।

একদিন খুব চিন্তিতভাবে লখাই বলল, “আচ্ছা বগাদা, তোমার তো মোটে শরীরই নেই, তা হলে আছো কী করে?”

বগাও ভারী ভাবনায় পড়ে গিয়ে বলল, “সে কথাটা নিয়ে আমিও অনেক ভেবেছি, বুঝলি! কিন্তু ভেবে থই করে উঠতে পারিনি।”

“আচ্ছা, তোমার কি খিদে পায়?”

“না তো !”

“অসুখবিসুখ করে?”

“না।”

“ভীমরুলে হুল দিলে ব্যথা পাও?”

“উঁহু।”

“তা সেটা তো ভাল কথা। কিন্তু কী করে বর্তে আছো সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।”

“হুঁ। হাওয়া-বাতাসের মতো একটা মিহিন জিনিস হয়ে গিয়েছি বলে মনে হয়।”

“কিন্তু সেখানেও কথা আছে। হাওয়া-বাতাস তো আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু তোমাকে তো দিব্যি দেখতে পাচ্ছি। তুমি ঢ্যাঙা, রোগা গড়ন, লম্বাটে মুখ, মাথায় ছোট-ছোট চুল। এমনকী, পরনে ধুতি আর গায়ে ফতুয়া পর্যন্ত আছে। একটু আবছা-আবছা বটে, কিন্তু দেখা তো যাচ্ছে!”

“কথাটা মন্দ বলিসনি। না থেকেও আছি কী করে, সেটা আমিও ঠিক বুঝতে পারি না। তুই বরং বিজয়বাবুকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখিস। তার মেলা বিদ্যে। দিনরাত রাশিরাশি কেতাবের মধ্যে ডুবে আছে। দেখবি, ঠিক ফস করে বলে দেবে।”

“ঠিক বলেছ তো! কথাটা আগে কেন মাথায় খেলেনি সেটাই ভাবছি।”

তিন

তা বিজয় রায়ের বাড়িতে লখাইয়ের অবারিত দ্বার, খালুইভর্তি মাছ রোজ সে রায়বাড়িতেই বিক্রি করে পয়সা ট্যাকে গুজে বাড়ি ফেরে। তাই সে একদিন বিজয়বাবুকে গিয়ে ধরল।

বিজয়বাবুর ঘরখানা দেখলে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। ঘরের চারখানা দেওয়াল যেন ইট গেঁথে তৈরি হয়নি, হয়েছে বই গেথে। মেঝে থেকে ছাদ অবধি তাক-ভর্তি শুধু বই আর বই। টেবিলে বই, চেয়ারে বই, বিছানায় বই, মেঝেতেও স্তুপ হয়ে পড়ে আছে বই। শোনা যায়, বিজয়বাবুর স্নানের ঘরেও নাকি মেলা বই। বিজয়বাবুকে বই ছাড়া কমই দেখা যায়। সর্বদাই চোখে ভারী চশমা এটে নাকের সামনে বই মেলে ধরে পড়ে যাচ্ছেন তো পড়েই যাচ্ছেন।

লখাই ঘরে ঢুকে জুত করে বিজয়বাবুর পায়ের কাছে মেঝেতে বসে পড়ে বলল, "বাবু, একটা কথা আছে।"

বিজয়বাবু চোখের সামনে থেকে বইখানা ঈষৎ সরিয়ে বললেন, "লখাই নাকি রে? কী দরকার?"

"আজ্ঞে, একটা সমিস্যেয় পড়ে আসা।"

"কীসের সমস্যা?"

"সমিস্যেটা ভূত নিয়ে।"

"অ। তা আমার কাছে কেন রে? পীতাম্বর ওঝার কাছে গেলেই তো হয়। না হলে বিভূতি ডাক্তারকে ডেকে মৃগীর চিকিৎসা করা।"

"আজ্ঞে, কাউকে ভূতে ধরেনি আজ্ঞে।"

"ধরেনি? তা হলে সমস্যা কীসের?"

"ভূত জিনিসটা কী দিয়ে তৈরী আর মরার পরও তারা বেঁচে থাকেন কী করে, এ দুটো জিনিস একটু বলে দিলে ভাল হয়।"

বিজয়বাবু অট্টহাসিটা ভালই হাসেন। অনেকটা ঔরঙ্গজেবের মতো। যাত্রাপালাটা দেখেছে লখাই। হেসে নিয়ে বিজয়বাবু বললেন, "শোন, ভূত বলে কিছুই নেই, আর মরার পর তারা কেউ বেঁচেও নেই, বুঝলি! এখন যা, মাথায় ঠান্ডা জল চাপড়ে ভাত খেয়ে গিয়ে ঘুমো।"

লখাই শশব্যস্তে বলল, "আজ্ঞে, না মশাই, বগাদার সঙ্গে যে প্রায়ই আমার দেখা হয়, কথাবার্তাও হয়।"

"বগাটা আবার কে?"

"বগা সামন্ত, আজ্ঞে। একশো বছর আগে সাপকাটিতে মারা গিয়েছিল। তা তিনিই কথাটা জানতে চেয়েছেন।"

বিজয়বাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "তা ভূত যদি আমার কাছে এসে জানতে চায়, তা হলে না হয় দেখা যাবে। এখন যা তো, বিরক্ত করিস না।"

লখাই মনখারাপ করে ফিরে এল। পরদিন বগাকে বলল, "না বগাদা, উনি মোটে মাথাই পাতলেন না। ভূতকে ভারী তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন বলেই মনে হল।"

বগাও হতাশ হয়ে বলল, "তা কী আর করবি? আমাদের কপালই খারাপ।"

তিন-চারদিন পর অবশ্য বিজয়বাবুকে একটু নড়েচড়ে বসতে হল।

রাত তখন বারোটা বেজে গিয়েছে। বিজয়বাবু বসে একমনে একখানা বিজ্ঞান বিষয়ক বই পড়ছেন। বাহ্যজ্ঞান নেই।

ঠিক এই সময় কে যেন খুব বিনয়ের সঙ্গে একটু গলাখাকারি দিয়ে ডাকল, "বাবু, একটু নিবেদন ছিল, আজ্ঞে।"

বিজনবাবু অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁর সামনে হাতজোড় করে একজন বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে।

বিজয়বাবুদের বিরাট পরিবার, বাড়িটাও বিশাল বড়। আত্মীয়স্বজনে ভর্তি। তা ছাড়া কাজের লোকও মেলা। সবাইকে বিজয়বাবু চেনেনও না।

বললেন, "কী চাই?"

"আজ্ঞে, আমাকে সুধীরবাবু পাঠালেন। উনি একটু মিটিং নিয়ে ব্যস্ত বলে নিজে আসতে পারলেন না। তাই আমাকেই পাঠিয়েছেন কথাটা বলতে।"

বিজয়বাবু ভ্রু কুঁচকে বললেন, "সুধীরবাবু! সুধীরবাবুটা আবার কে?"

লোকটা শশব্যস্তে বলল, "আজ্ঞে, ন'পাড়ার সুধীরবাবুর কথাই বলছি। সুধীর ঘোষ।"

বিজয়বাবু অবাক হয়ে বললেন, "সুধীর ঘোষ! তা কী করে হয়? গত বিষ্যুদবার না শুক্রবার, কবে যেন তার শ্রাদ্ধের ভোজ খেয়ে এলাম যে?"

লোকটা হাত কচলে ভারী আহ্লাদের সঙ্গে বলল, "আজ্ঞে, তা ভোজটা কেমন ছিল বাবু?"

বিজয়বাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "তা ভালই তো ছিল। লুচি, বেগুনভাজা, মোচার চপ, ধোকার ডালনা, ছানা ভাপে, ছোলার ডাল, চাপড়ঘণ্ট, ফুলকপির রোস্ট, আমসত্ত্বের চাটনি, দই, সন্দেশ, রসগোল্লা, রসমালাই। হ্যাঁ, তা বেশ ভালই খাইয়েছিল। যার শ্রাদ্ধ হয়ে গিয়েছে, সেই লোক তোমাকে পাঠায় কী করে?"

লোকটা হেঁ হেঁ করে একটু হেসে বলল,"আজ্ঞে, সেটাই তো সমস্যা। এই সমস্যার একটা বিহিত যে আপনাকে করে দিতেই হবে!"

"তুমি কি বলতে চাও যে, সুধীর ঘোষ আদৌ মারা যাননি? তা হলে কি মারা যাওয়ার আগেই তার ছেলেরা আগাম শ্রাদ্ধ করে রাখল? কিন্তু তাই বা হয় কী করে? সেরকম তো নিয়ম নয়! লোকে নিজের আগাম শ্রাদ্ধ করে রাখতে পারে বটে, কিন্তু ছেলেরা কি তা পারে?"

লোকটা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলল, "না বাবু না, তিনি নির্যস মরেছেন। সুধীর ঘোষ মোটেই বেঁচে নেই। আবার মরেও বেঁচে আছেন, আর এইটেই সমস্যা। এই আমি

যেমন। গত বছর বোশেখ মাসে সান্নিপাতিকে মরেছি। কিন্তু দেখুন, এখনও কেমন টিকে আছি!”

বিজয়বাবু আঁতকে উঠে বললেন,“মরেছ মানে? মরেছ বললেই হবে?”

লোকটা করুণ গলায় বলল, “ওই তো আপনাদের দোষ! পণ্ডিত মানুষরা সহজে কিছু বিশ্বাস করতে চান না। ঠিক আছে, তা হলে নিজের চোখেই দেখুন, বেঁচে আছি কি না।”

বলেই লোকটা বিজয়বাবু চোখের সামনেই ফুস করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। বিজয়বাবু হা। তারপর তার চোখের সামনেই যেন একটা অদৃশ্য দরজা খুলে গ্যালগ্যালে হাসিমুখে বেরিয়ে এসে লোকটা হাতজোড় করে বলল,“দেখলেন তো?”

বিজয়বাবু হাতের বইটা পাশের টেবিলে রেখে খুব চিন্তিত মুখে বললেন, “তাই তো! এ তো খুব মুশকিলে ফেলে দিলে দেখছি। কয়েকদিন আগে আমাদের লখাইও এরকম কী একটা বলতে এসেছিল।”

“তা বাবু এবার একটু বইপত্তর ঘেঁটে দেখবেন নাকি, আমাদের কথা কিছু লেখা আছে কি না?”

“দেখছি। ভূতের উপরেও কিছু বই আমার আছে বটে। সেগুলো ভাল করে পড়া হয়নি। এবার পড়তেই হবে।”

লোকটা তাকে একটা নমো ঠুকে হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার পর বিজয়বাবু কিছুক্ষণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন। তারপর হঠাৎ তার খেয়াল হল, আমি কি সত্যিই ভূত দেখলাম? অ্যাঁ, ভূত দেখলাম নাকি আমি? ওরে বাবা! আমি যে ভূত দেখে ফেললাম! বলতে বলতেই তাঁর লোম খাড়া হয়ে উঠল। মাথার চুল সব শজারুর কাটার মতো দাড়িয়ে যেতে লাগল। শরীর ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। গলা দিয়ে স্বর ফুটতে চাইছিল না। তবু প্রাণপণে হাত-পা ছুড়ে তিনি বিকট গলায় চেঁচাতে লাগলেন, “ভূত। ভূত! ভূ-উ-ত! ভু...।”

ওই বিকট চেঁচানিতে ঘুম ভেঙে বাড়ির লোকজন সব ছুটে এল। হাতপাখা এল, জল এল, মহা শোরগোল পড়ে গেল চারদিকে।

পরদিন সকালেও নিজের ডেকচেয়ারটিতে কাহিল হয়ে এলিয়ে বসে বিজয়বাবু আপনমনে বিড়বিড় করে যাচ্ছিলেন, “আমি কি ভূত দেখে ফেললাম নাকি রে বাবা? ওরে বাবা, আমি যে ভূত দেখে ফেললাম! অ্যাঁ, সত্যিই কি দেখে ফেললাম নাকি? বাপ রে! তবে কি দেখেই ফেললাম? অ্যাঁ?”

হাড়কিপটে নীলমণি ঘোষ এসে বললেন, “আহা, দেখেই যখন ফেলেছ তখন তো ল্যাটা চুকেই গিয়েছে। এ হল শীতকালে জলে ডুব দেওয়ার মতো। প্রথম ডুবটা দিয়ে ফেললেই হল, তারপর যত খুশি ডুব দাও। একবার ভূত দেখে ফেললে তো আড় ভেঙেই গেল হে! আর ভয়টা কীসের?”

বিজয়বাবু এতই আনমনা যে, প্রথমটায় নীলমণি ঘোষকে চিনতেই পারলেন না। শুধু বললেন, “ওরে বাবা রে, আমি যে ভূত দেখেছি! দেখেই ফেলেছি!

একেবারে স্বচক্ষে দেখে ফেললাম যে!"

স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক বিধুভুষণ চাকি এসে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বললেন, "ভূত দেখেছেন মানে? ভূত অমনি দেখলেই হল? এর পর তো লোকে সাপের পা, ডুমুরের ফুল এসবও দেখতে পাবে? না না, বিজয়বাবু, আপনাকে আমি একজন বিজ্ঞানমনস্ক, শিক্ষিত, যুক্তিবাদী লোক বলে জানতাম। শেষ অবধি আপনিও যদি ওসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করতে শুরু করেন, তা হলে তো দেশ উচ্ছন্নে যাবে?"

শুটকো অনাদি মিত্তির খ্যাক করে উঠে বললেন, "বেশি ফ্যাচফ্যাচ কোরো না তো বিধু! বিলেতের একটা ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানীরা নিয়মিত ভূত দেখতে পায়। আর সেটা একজন বৈজ্ঞানিকেরই ভূত।"

"এ খবর আমিও পড়েছি। তারা ভুল দেখেছে।"

হরেন কাঁড়ার বুড়োমানুষ। দাড়ি নেড়ে বললেন,"গোপালহাটির দুটো জিনিস খুব বিখ্যাত। একটা হল, ষষ্ঠী ময়রার মাখাসন্দেশ, আর হল, এখানকার ভূত! আগে তো সাহেবসুবোরাও জুড়িগাড়ি চেপে গোপালহাটির ভূত দেখতে আসত। সন্ধের পর ভূতেরাও সব সেজেগুজে বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু সেই দিনকাল কি আর আছে? ষষ্ঠী ময়রার মাখাসন্দেশেও আর সেই সোয়াদ নেই, ভূতেরাও সব গায়েব। তা বিজয়ভায়ার ভাগ্য ভাল যে, অন্তত একখানা ভূতের দেখা পেয়েছে। তাতে গোপালহাটির মানটা অন্তত বাঁচল!"

গদাধর সমাদার প্রতিবাদ করে বলল, "না না, হরেনজ্যাঠা, এ আপনি কী বলছেন? গোপালহাটিতে এখনও ভূত গিজগিজ করছে। এই তো সেদিন নীলকুঠিতে সন্ধেবেলা স্বচক্ষে আমি একজোড়া সাহেব-মেমকে হাত ধরাধরি করে ঘুরতে দেখেছি।"

গোপীনাথ সামন্ত ডন-বৈঠক করে, ছোলা খায়, গুলি ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সে তেজালো গলায় বলে উঠল, "ওসব ভুতফুত কিছু নয়। আসুক দেখি ভূত আমার সামনে, কেমন বুকের পাটা? ভূতের গুষ্টির তুষ্টি করে ছেড়ে দেব না।"

মৃগেন মিত্তির রোগাভোগা হলেও গলার জোর আছে। হেঁকে বলল, "অত বীরত্ব ফলিয়ো না হে! ভূতের সঙ্গে লড়তে চাও তো একবার আমার শ্বশুরবাড়ি গ্যাদরাপোতা থেকে ঘুরে এসো, বীরত্ব চুপসে যাবে। সেখানে চালে ভূত, ডালে ভূত, জলে ভূত, গাছে ভূত, ছাদে ভূত, একেবারে ভূতে ভূতাক্কার। আমার শাশুড়ি তো সেদিন কাঁচকলা ভেবে একটা ভূতকেই ভাতে সেদ্ধ দিয়েছিলেন। গরমভাত থেকে তুলে ছাল ছাড়াতে যাবেন, অমনি কাঁচকলাটা লাফ দিয়ে উঠে ফের গিয়ে গাছে ঝুলে পড়ল। ভূত-সেদ্ধ হওয়া ভাত তো আর খাওয়া যায় না। একহাড়ি ভাত ফেলা গেল!"

দোলগোবিন্দ প্রামাণিক খুব হুঁশিয়ার মানুষ বলে সবাই জানে। কখনও কারও নাম ভুল হয় না। জন্মে সে কোনও দিন পয়সা, চশমা, কলম, চটি, আংটি বা ঘড়ি হারায়নি। বাজার থেকে সতেরোটা জিনিস আনতে দেওয়া হলে কখনও ষোলোটা

আনেনি। সেই দোলগোবিন্দ খুব চিন্তিত মুখে বলল, “ভৌতিক কাণ্ড যে একটা হচ্ছে সেটা আমারও মনে হয়। সবাই জানে যে, আমার বড় একটা ভুল-টুল হয় না। তা গতকাল বুকপকেটে বাহান্ন টাকা নিয়ে বাজারে গিয়েছি। দাম দিতে গিয়ে দেখি, টাকাটা নেই। সাবধানের মার নেই বলে আমি বুকপকেটে সেফটিপিন দিয়ে টাকা আটকে রাখি, যাতে পকেটমার না হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল, সেফটিপিন যেমন ছিল তেমনই আছে, কিন্তু টাকাটা হাওয়া। আমার জীবনে এমন কাণ্ড এই প্রথম। হাঁ করে আকাশ-পাতাল ভাবছি, হঠাৎ প্যান্টের বা পকেটে হাত দিয়ে দেখি, সেই বাহান্ন টাকা আমার বা পকেটে ঢুকে বসে আছে। ভৌতিক কাণ্ড ছাড়া একে আর কী বলা যায় বলো তো?”

বৃন্দাবন কর্মকার বলে উঠল, “ওহে, ওরকম কাণ্ড তো আমার পরপর দু’দিন হল। আমার ডান দিকের ট্যাকে নস্যির ডিবে থাকে, বহুকালের অভ্যেস। দু’দিন হল দেখছি, ডিবেটা যতই ডান ট্যাকে গুজি না কেন, সেটা ঠিক আমার বাঁ ট্যাকে চলে আসছে। ভূতটুত আমি বিশ্বাস করি না বটে, কিন্তু কাণ্ডটার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝেও উঠতে পারছি না।”

অনাদি মিত্তির বললেন, “তোমাদের কথায় মনে পড়ল, আমার বাড়িতেও কিন্তু অশৈলী কাণ্ড হয়েছে। গত দু’দিন হল দেখছি, দরজা এঁটে রাতে আমরা শুতে যাই, কিন্তু সকালে উঠে দেখি, খিল, ছিটকিনি সব খোলা। ঘরের জিনিসপত্র কিছু খোয়া যায়নি ঠিকই, কিন্তু জিনিসপত্র কে যেন উলটে-পালটে রেখে গিয়েছে। যেমন আলমারির মাথায় রাখা চামড়ার সুটকেসখানা কে যেন দরদালানে আলনার নীচের তাকে রেখে গিয়েছে। টেবিলঘড়িখানা রেখে গিয়েছে ঠাকুরঘরে। রোজ সকালে গীতা পাঠ করি বলে সেখানা আমার শিয়রে একটা টুলের উপর থাকে। তা দেখি, কে যেন গীতাখানা বইয়ের তাকে তুলে রেখে তার বদলে ‘সচিত্র গোপালভাঁড়’ বইখানা শিয়রে রেখে গিয়েছে।”

বিধুভুষণ চাকি মাথা চুলকে বললেন, “এসব আসলে মনের ভুল ছাড়া কিছু নয়। দুদিন হল দেখছি, আমার ড্রয়ারে রাখা চাবি বালিশের তলায় পাওয়া যাচ্ছে। আমার গিন্নির দোক্তার কৌটো গিয়ে সবজির ঝুড়িতে ঘাপটি মেরে আছে। তা বলে কি আর এসব ভূতুড়ে ব্যাপার!”

বিজয়বাবু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে এসব কথা শুনছিলেন। কিন্তু তার মাথায় কিছুই সেধোচ্ছিল না। মগজটা বড্ড ভোম্বল হয়ে আছে আজ।

দুপুরবেলা যখন ঘরখানা নিরিবিলি হল, তখন খুব ভয়ে-ভয়ে অনেক দোনোমোনো করে তাঁর বইয়ের তাক থেকে ভূত বিষয়ক বইগুলো খুঁজেপেতে বের করলেন। বুকটা একটু ধুকপুক করছে বটে, তবু চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে বই খুলে বসে গেলেন।

তিনি হলেন জাতপড়ুয়া। একবার বই খুলে ফেললেই তিনি তাতে ডুবে যান, আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। যখন বেলা পড়ে বাইরের আলো মরে এল, তখন চোখ তুলে বাইরেটা দেখলেন জানালা দিয়ে। তাই তো, সন্ধে যে হয়-হয়! আলো

জ্বালাবার জন্য যেই উঠতে যাচ্ছেন, অমনি আঁতকে উঠে দেখলেন, তাঁর সামনেই মেঝের উপর খাপ পেতে উবু হয়ে বসে একটা আধবুড়ো লোক তাকে জুলজুল করে দেখছে। কাঁচাপাকা চুল, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। তার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল যে, ইস্তফা দেয় আর কী ! তিনি প্রথমটায় বাক্যহারা, তারপর কোক করে একটা শব্দ বেরোল, তারপর ক্ষীণ গলায় বলে উঠলেন, "ভূ-ভূত! ভু-ভূত। ভূ-ত! আ-আ-আ... "

লোকটা টপ করে উঠে এসে দুটো শক্ত হাতে তাকে ধরে বসিয়ে দিয়ে ভারী অমায়িক গলায় বলল, "আজ্ঞে, আমি ঠিক ভূত নই।"

কথাটা শুনে লোকটাকে ভারী ভাল লোক বলে মনে হল বিজয়বাবুর। যারা ভূত নয় তাদের মতো ভাল আর কে আছে? তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য বললেন, "ভূত নন?"

লোকটা যেন একটু চিন্তায় পড়ে গেল। মাথাটাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে, ভূত হতে বেশি বাকিও নেই। তিনকুড়ি বয়স তো আর ছেলে-ছোকরার বয়স নয়। তবে ভূত হতে গেলে মরারও একটা নিয়ম আছে কিনা! তা সেটা আমার এখনও হয়ে ওঠেনি।"

বিজয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন "তবে আপনি কে?"

একগাল হেসে লোকটা বলল, "আমি হলুম একজন লোক।"

শুনে বিজয়বাবু ভারী খুশি। আহ্লাদের গলায় বললেন, "লোক হলেই হবে। লোকেদের মতো ভাল লোক আমি কোথাও দেখিনি।"

লোকটা তাড়াতাড়ি বলল,"আজ্ঞে, নির্যস লোক। তবে ভাল লোক কি না বলা ভারী মুশকিল।"

বিজয়বাবু অত্যন্ত উদার গলায় বললেন, "আহা, খারাপটাই বা কী? দিব্যি হাত-পা-মুন্ডু রয়েছে, বাতাসে ফুস করে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন না, আর চাই কী? আমার তো কিছু খারাপ মনে হচ্ছে না আপনাকে!"

লোকটা একগাল হেসে বলল, "আজ্ঞে, সেটা আমারও মনে হয় না। তবে কিনা আমার একটু বদনামও আছে।"

"আহা, সে তো আমারও আছে।"

লোকটা ভারী অবাক হয়ে বলল, "আপনার বদনাম? বলেন কী মশাই? আপনার আবার বদনাম কীসের? সাতে নেই, পাঁচে নেই, দিনরাত বই-বোকা হয়ে বসে আছেন, বদনাম হতে যাবে কেন?"

"বইপোকা বললেন নাকি?"

"না। আমি তো বললাম বই-বোকা, আপনি কি পোকা শুনলেন নাকি?"

"সেরকমই যেন মনে হল। তা সে যাকগে। আমারও বেশ বদনাম আছে কিন্তু...!"

"সেটা কীরকম?"

“আচ্ছা, আপনি ‘কোকাই কার্তিক’ কথাটার মানে জানেন?”
“আজ্ঞে, না। আমি মুখ্যসুখু মানুষ!”
“তা হলে ফুস্কামলে’ কাকে বলে তা কি জানা আছে?”
“এই তো মুশকিলে ফেললেন। এসব তো শক্ত-শক্ত কথা!”
“তা হলে অন্তত ‘গোবরগণেশ’টা তো নিশ্চয়ই জানেন?”
লোকটা একগাল হেসে বলল, “আজ্ঞে, খুব জানি, খুব।”

“তা লোকে আমাকে কোকাই কার্তিক, ফুসকামলে এবং গোবরগণেশও বলে থাকে। আমি অবশ্য এসবের মানে জানি না।

তবে খুব ভাল কথা বলে মনে হয় না। কী বলেন?”

“আজ্ঞে, আমারও মনে হচ্ছে, এগুলো খুব একটা ভাল কথা নয়।”

“তা ছাড়া লোকে আমাকে ‘জ্ঞানী গেড়ে’, ‘কুমড়োমুখো’, ‘বিদ্যাছাগলী’ ও বলে থাকে। তবেই বুঝুন, আমারও বদনাম কিছু কম নেই। তা আপনার বদনামটা কোন লাইনে?”

এ কথায় লোকটা ভারী লজ্জা পেয়ে বলল, “সে আর আপনার শুনে কাজ নেই।”

“দেখুন মশাই, আমি শ্রমের মর্যাদা বুঝি। পৃথিবীতে কোনও কাজই ফ্যালনা নয়। সব কাজেরই বিহিত-মর্যাদা আছে, তা চুরিডাকাতি হলেও।”

“বাঃ, আপনি তো বড় ভাল-ভাল কথা বলেন মশাই? প্রাণটা জল হয়ে গেল! তা আমার বদনামটা ওই লাইনেই। পকেটমারি, চুরি, কেপমারি, এইসব আর কী! তা ধরুন, পেটের দায়ে আমাদের তো বাছাবাছি চলে না। যখন যেটা হয় আর কী!”

“বাঃ, শুনে খুব খুশি হলাম।”

“তা মশাই, আপনার ঘরে যে বই একেবারে গিজগিজ করছে? ঘরখানা কি আপনি ইটের বদলে বই দিয়েই বানিয়েছেন?”

“আরে না না, বইয়ের পিছনে ইটও আছে।”

“আছে? যাক, শুনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল! শুধু বই দিয়ে দেওয়াল গাথলে বৃষ্টিবাদলা হলে মুশকিল কিনা! তা এত বই পড়ে কে?”

“কেন, আমিই পড়ি।”

লোকটা বড়-বড় চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, “একা?”

“একাই! আমার বাড়িতে আর কেউ তেমন পড়ুয়া নয়।”

“একা এত বই সাপটে ওঠা তো চাট্টিখানি কথা নয় মশাই!

আরও দু-চারটে লোক লাগিয়ে দিলে আপনার এত মেহনত করতে হত না। ভাগ-ভাগ করে পড়ে ফেলতেন। দশে মিলি করি কাজ হারি-জিতি নাহি লাজ। তা মশাই, এত লেখাপড়া করতে হচ্ছে কেন আপনাকে? সামনে কি কোনও পাশের পরীক্ষা আছে? গতবার কি পরীক্ষায় ফেল হয়েছিলেন?”

বিজয়বাবু মহা অস্বস্তিতে পড়ে গিয়ে বললেন, “আরে না না, কী মুশকিল, পরীক্ষা-টরিক্ষা নয়। লোকে জানার জন্যই বই পড়ে।”

লোকটা একগাল হেসে বলল, “কী যে বলেন বাবু! বই পড়ে কি কিছু জানা যায়? আমাদের শশধরমাস্টার তো এত বই ঘাটে, ঝিঙে আর ধুধুলের বিচির তফাত ধরতে পারল কি?”

কথাটা শুনে বিজয়বাবু ভারী চিন্তায় পড়ে গেলেন। তাই তো! ঝিঙের বিচি আর ধুধুলের বিচির তফাত তো তারও জানা নেই! সত্যি কথা বলতে কী, বিচি

কেন, স্বয়ং ঝিঙে বা ধুধুলকেও তার মনে পড়ল না। অথচ তার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি ঝিঙে এবং ধুধুলের নাম শুনেছেন এবং সম্ভবত, খেয়েও থাকবেন।

একটু বেকায়দায় পড়ে গেলেন। মিনমিন করে বললেন, "ইয়ে, বলছিলাম কী, পৃথিবীতে কত কিছু জানার আছে। তাই না?"

"আছে বই কী! কত কী জানার আছে, তবে কেতাব পড়ে সেসব জানার জো নেই কিনা! ধরুন, ধান আর চিটের তফাত একজন মুখ্যু চাষা লহমায় বুঝে ফেলবে। আপনি সাতশো কেতাব ঘেঁটেও পেরে উঠবেন না।"

এই রে! ধান আর চিটের তফাত যে তিনিও জানেন না! লজ্জা পেয়ে বিজয়বাবু যেন গুটিয়ে ছোট্টটি হয়ে গেলেন। মনে মনে তাকে স্বীকার করতে হল যে, এসব জরুরি জিনিস তার জেনে রাখা উচিত ছিল। বই পড়ে তিনি অনেক কিছু জেনেছেন বটে, কিন্তু এখনও জ্ঞানের তেপান্তর সামনে পড়ে আছে। জ্ঞানের দিক থেকে তিনি যে নিতান্তই বেঁটেখাটো একরত্তি একটা মানুষ, এটা আজই প্রথম টের পেলেন তিনি। আমতা আমতা করে বললেন, "তা আপনি বেশ জানেন-শোনেন দেখছি!"

লোকটা ভারী অমায়িক গলায় বলল, "এ আর এমন কী? এই যে কাল রাত্তিরে আপনি ভূত দেখলেন, তা ভূত কী বস্তু দিয়ে তৈরি তা বুঝতে পারলেন কি?"

বিজয়বাবু সাগ্রহে বললেন, "না তো! আপনার জানা আছে নাকি?"

"তা আর জানি না! ফুলের রেণু, প্রজাপতির পাখনা আর মাকড়সার লালা, এই তিন বস্তু মিলিয়ে ভূত তৈরি হয়। ভারী মিহিন জিনিস, হাত দিলে বস্তুটা টেরই পাওয়া যায় না।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান, কথাগুলো টুকে রাখি।"

ডান হাতে খালুইভরা মাছ আর বাঁ কাঁধে ফাদি জালটা নিয়ে অন্ধকারে ফিরছিল লখাই জংলা জায়গাটা পেরিয়ে রাস্তায় ওঠার মুখে থমকাল। অন্ধকারটা তার চোখে সয়ে গিয়েছে। দেখল, দুটো লোক দাঁড়িয়ে এদিক পানেই চেয়ে আছে। ভূতের ভয়টা আজকাল মন থেকে উবে গিয়েছে তার। কিন্তু ভয়-ভীতি তো নানারকম আছে। কে জানে কেন, তার বুকটা একটু দুরুদুরু করে উঠল।

হঠাৎ একটা টর্চের জোরালো আলো তার মুখে এসে পড়ল। কে যেন বলে উঠল, "কে রে তুই?"

লখাই ভয় খেয়ে বলল, "আমি লখাই।"

"কে লখাই? চোর-ছ্যাচোড় নাকি রে?"

"আজ্ঞে, না।"

"ধুস! চোর-ছাচোড় হলেই বরং আমাদের সুবিধে হত। তা কী মাছ ধরলি রে? চুনো পুটি, না রাঘববোয়াল?"

"আজ্ঞে, চুনোপুটি।"

"বেশ বেশ! মাছধরা তো খুব ভাল জিনিস। মৎস্য মারিব খাইব সুখে, কী বলিস?"

"যে আজ্ঞে !"

এবার দ্বিতীয় লোকটা দু পা এগিয়ে এসে বলল, "কিছু মনে কোরো না বাপু লখাই, আমরা একটু বিপদে পড়েই এসেছি। আসলে কী জানো, আমাদের বাবা হঠাৎ করে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। গত দুদিন ধরে আমরা গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। মজবুত চেহারার ষাট-বাষট্টি বছর বয়সের একজন বুড়ো মানুষকে কি দেখেছ? মাথার চুল ছোট করো ছাঁটা। গালে খোচা-খোচা দাড়ি। পরনে টাইট করে পরা ধুতি আর গায়ে ফতুয়া?"

লখাই সভয়ে মাথা নেড়ে বলল,"আজ্ঞে না।"

"আহা, অত তাড়াহুড়ো করে জবাব দেওয়ার দরকার নেই। একটু ভেবেচিন্তেই না হয় বললে!"

"গাঁয়ে লোক এলে জানাজানি না হয়ে উপায় আছে? না মশাই, উনি এ গাঁয়ে আসেননি।"

"ঠিক আছে। আমরা ঘুরেফিরে আবার আসব'খন। যদি খবর দিতে পারো তো বখশিশ পাবে।"

"যে আজ্ঞে।" লোক দুটো হেলতে-দুলতে চলে গেল। একটু দূর থেকে শোনা, দু'জনের একজন দিব্যি শিস দিতে দিতে যাচ্ছে। যার বাপ হারায় তার কি শিস দেওয়ার কথা?

বিজয়বাবুর বাড়িতে মাছটা পৌঁছে দিতে গিয়ে আজ তাজ্জব হয়ে গেল লখাই। সেই বুড়ো লোকটা, টাইট ধুতি, খোঁচা চুল, খোঁচা দাড়ি, বিজয়বাবুর পড়ার ঘরে বসে দিব্যি গল্প জুড়ে দিয়েছে যে!

সন্ধেবেলা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে বড় জা শশীমুখী, বিজয়বাবুর গিন্নি মূর্ছনাদেবী, সেজো জা নয়নতারা আর ছোট জা বাসবী আংড়া জ্বেলে তার কাছে বসে আগুন পোয়াতে-পোয়াতে গল্পগাছা করছেন। ঠিক এই সময় বিজয়বাবু হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "ওগো, এককাপ চা পাঠিয়ে দাও শিগগির। অনেকদিন বাদে মৃগাঙ্কদা এসেছেন।"

মূর্ছনাদেবী অবাক হয়ে বললেন, "মৃগাঙ্কদা! মৃগাঙ্কদাটা আবার কে?"

"আহা, আমাদের মৃগাঙ্ক সান্ডেল গো। বাবুপাড়ার মৃগাঙ্কদা।"

এবার শশীমুখী অবাক হয়ে বললেন, "তোমার কি মাথা খারাপ হল ঠাকুরপো? মৃগাঙ্ক সান্ডেল আসবে কী করে?"

"কী করে মানে? আসতে নেই নাকি?"

শশীমুখী মুখঝামটা দিয়ে বললেন, "না, নেই! মৃগাঙ্ক সান্ডেল যে দু' বছর হল মরেছে!"

“অ্যাঁ!” বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন বিজয়বাবু। বললেন, “তাই তো! এসব হচ্ছে কী?”

আবার মূর্ছার মতো অবস্থা হল। জল এল, পাখা এল। খবর পেয়ে বুড়ো ডাক্তার যতীন পত্রনবিশও এসে হাজির। বুকে নল বসিয়ে, নাড়ি টিপে বিস্তর পরীক্ষা করে বললেন, “এ হয় সিজোফ্রেনিয়া, নয়তো বায়ু থেকে হ্যালুসিনেশন।”

“বায়ু!” কথাটা খুব পছন্দ হল বিজয়বাবুর দাদা অজয় রায়ের। তার পরনে গামছা, হাতে ঘটি। তিনি বললেন, “বায়ু হবে না! কোষ্ঠকাঠিন্য থেকেই তো বায়ু হয়। ডবল ডোজের জোলাপ ঠেসে দিন, বায়ু হাওয়া হয়ে যাবে।”

অজয়বাবুর কাছে কোষ্ঠকাঠিন্য ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও সমস্যাই নেই। সব রোগ, সব অশান্তি, সব গণ্ডগোলের মূলেই রয়েছে কোষ্ঠকাঠিন্য। এই জন্যই তিনি দিন-রাত হতুকি, ত্রিফলা, চিরতা, ইসবগুল খেয়ে থাকেন এবং দিনমানের বেশিরভাগ সময়ই তাকে গামছা পরা অবস্থায় ঘটি হাতে পায়চারি করতে দেখা যায়।

মূর্ছনাদেবী ঝংকার দিয়ে বললেন, “বায়ু নয় ডাক্তারবাবু, মাথার ব্যামো হয়েছে। তা মাথার ব্যামোর আর দোষ কী? দিন-রাত বই মুখে করে বসে থাকলে ভূত-প্রেত তো দেখবেই।”

শশীমুখী বললেন, “সত্যি কথা বাছা, ওসব ঝুরঝুরে পুরনো বইয়ের মধ্যে ভূত-প্রেতের বাসা হলে আশ্চর্যের কিছু নয়। বইগুলো এবার সেরদরে পতিতপাবনের কাছে বেচে দে মুর্ছনা! সব ঠোঙা হয়ে যাক।”

একথা শুনে নিজীব বিজয়বাবু পট করে উঠে বসলেন। বললেন, “সর্বনাশ! ও কাজও কোরো না! মৃগাঙ্কদা তো সেই কথাই বলতে এসেছিলেন!”

মূর্ছনাদেবী অবাক হয়ে বললেন, “কোন কথা?”

আমতা আমতা করে বললেন, “বইয়ের কথাই কী যেন বলছিলেন। এখন ঠিক মনে পড়ছে না।”

শশীমুখী রাগ করে বললেন, “সব বাড়িতেই এক-আধটা পাগল থাকে ঠিকই। এই তো পালবুড়ো সারাদিন বিড়বিড় করে বকছে আর কাকে যেন কী দেখাচ্ছে। সামন্তবাড়ির বড়গিন্নি দিনরাত বাড়ির ছেলে-বুড়োকে গোবরজলে নাইয়ে ছাড়ছেন। ঘোষবাড়ির মেয়ে শেফালির বিয়ে হল না বলে সারাদিন বউ সেজে বসে থাকে। তা সে এক-আধটা পাগল তবু সামলানো যায়। কিন্তু এ বাড়ির সব ক'টাই যে পাগল! কেউ কোষ্ঠপাগল, কেউ বইপাগল, কেউ স্বাস্থ্যপাগল, কেউ মিচকেপাগল, আর ছোটজন তো বদ্ধপাগল।”

শশীমুখীর মুখের উপর কথা কয় এমন সাহস এ বাড়ির কারও নেই। বড়কর্তা অজয়পদ গিন্নির মেজাজ দেখে সুড়সুড় করে বাথরুমের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন। সেজোভাই ব্যায়ামবীর সুজয়পদ মেজদাকে ময়ূরাসন শেখাবে বলে এসেছিল, বড়বউদির মেজাজ দেখে সে আর দাঁড়াল না। সান্ধ্য ব্যায়ামে হাজির হতে ব্যায়ামাগারের দিকে হাঁটা দিল। গন্ধক আর নিশিন্দা মিশিয়ে ধোয়া দিলে

ভূত-প্রেত পালায় কি না সেটা দেখার জন্য সলিউশনটা একটা কাচের পাত্রে নিয়ে এসেছিল অভয়পদ, অবস্থা বেগতিক দেখে সেও পিছু হটে নিজের রসায়নাগারে গিয়ে সেধিয়ে পড়ল। ছোট গুরুপদ নানা অপরাধে অপরাধী বলে সাহস করে ঘরে ঢোকেনি। বাইরে বসেই উকিঝুকি মারছিল। বড়বউদির গলা শুনেই সুট করে সরে পড়ল।

যতীনডাক্তার ব্যাগ গুটিয়ে উঠে পড়ে বললেন, "ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই বউমা। বংশটাও তো দেখতে হবে। ওদের বাপ শিবপদকে দ্যাখোনি? উঠোনে গর্ত করে তার ভিতর সেধিয়ে তন্ত্রসাধনা করত। এ বাড়িতে ভূতের পত্তন যদি কেউ করে থাকে, তবে সে-ই করে গিয়েছে। এখন ভূত-প্রেতের আনাগোনা হলে আশ্চর্যের কিছু নেই। তোমরা বরং বিরিঞ্চিওঝাকে খবর দাও গে!"

ডাক্তার বিদেয় হওয়ার পর মূর্ছনাদেবী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠলেন। শশীমুখী কিছু মিছে কথা বলেননি। এ বাড়ির লোকগুলো একটু কেমনধারা যেন আছে বাপু! তাঁর দেওর সুজয়পদ এমনিতে কিছু খারাপ নয়, কিন্তু তার সারা শরীরে চামড়ার নীচে যেন কিলবিলিয়ে মাগুরমাছ ঘুরে বেড়ায়। মূর্ছনাদেবী মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন, "হ্যাঁ রে সুজয়, তোর গায়ে যে সারাদিন মাগুরমাছ ঘোরে, তোর কাতুকুতু লাগে না?"

হ্যা-হ্যা করে হেসে সুজয় বলল, "তুমি এর মর্ম কী বুঝবে মেজোবউদি, এ হল গিয়ে মাসল, মাসল। এই হল বাইসেপ, এই হল ট্রাইসেপ, এই হল ল্যাটিসমাস আর এই হল সিম প্যাক।" বলে যখন নানা অঙ্গভঙ্গি করে সুজয়পদ আর মাগুরমাছগুলো আরও খলবলিয়ে ওঠে, তখন মূর্ছনাদেবীর মূছ যাওয়ার দশা। কিন্তু গায়ে জোর থাকলেই হবে? বাড়িতে সেদিন চোর আসতেই সুজয়পদ সবার আগে গিয়ে খাটের তলায় সেধিয়েছিল। অভয়পদ আরএক কাঠি সরেস। এম এসসি না কি ছাইভস্ম পাশ করে বাড়িতে একখানা রসায়নাগার খুলে নানারকম ওষুধবিষুধ তৈরি করছে দিনরাত। একদিন একটা শিশি হাতে নিয়ে বেরিয়ে সবাইকে দেখাল, এই যে দেখছ, সারাবাড়িতে ছড়িয়ে দিলে একটাও মশা থাকবে না। তা দিল ছড়িয়ে। তাতে মশা গেল কি না বোঝা গেল না, কিন্তু মাছির উৎপাতে সবাই অতিষ্ঠ। শুয়োপোকা তাড়াতে শিউলি গাছে ওষুধ দিয়েছিল। তাতে শুয়োপোকার সঙ্গে গাছটাও গেল মরে!

ছোট দেওর গুরুপদরও গুণের ঘাটতি নেই। পড়াশোনা গোল্লায় দিয়ে সাপুড়েদের কাছে সাপধরা শিখছে। জাদুকরের কাছে শিখছে জাদুবিদ্যা। কিছুদিন তান্ত্রিকের কাছে তালিম নিয়েছিল, তবলচির কাছে তবলা। যখন যেটা মাথায় চাপে সেটাই শিখতে লেগে যায়। এই তো কয়েকদিন আগে মদনপুরের হাট থেকে একটা বুড়োকে ধরে এনে বাড়িতে তুলেছে।

মূর্ছনাদেবী ভারী রেগে গিয়ে বললেন, "ওটা কাকে ধরে আনলি রে হতভাগা?"

একগাল হেসে গুরুপদ বলল, "ইনি কত গুণী লোক মেজোবউদি। এর একটা ইশকুল আছে।"

মূর্ছনাদেবী অবাক হয়ে বললেন, "স্কুল আছে তো থাক না। এ বাড়িতে এনে জোটালি কী করতে?"

গুরুপদ মাথা চুলকে বলল, "আসলে উনি স্কুলটা এ গাঁয়েই তুলে আনতে চান।"

"ও মা! গোপালহাটিতে সত্যশরণ মেমোরিয়াল স্কুল থাকতে আবার স্কুল কীসের?"

কাঁচুমাচু হয়ে গুরুপদ বলল, "এটা ঠিক ওরকম স্কুল নয় মেজোবউদি। এ হল একটা কারিগরি বিদ্যার স্কুল।"

কারিগরি বিদ্যা-টিদ্যা বোঝেন না মূর্ছনাদেবী। তবে এটা বোঝেন যে, তার এই ছোট দেওরটিরও মাথার দোষ আছে। আর বুড়ো লোকটাও যেন কেমনধারা! সবসময় জুলজুল করে চারদিকে চেয়ে নজর রাখছে। মূর্ছনাদেবী মোটেই ভাল বুঝছেন না।

রাতে রান্নাঘরে রুটি বেলতে বসে তিনি শশীমুখীকে বলেই ফেললেন, "বুঝলে দিদি, ওই বটু সর্দার এ বাড়িতে আসার পরই কিন্তু ভূত-প্রেতের উৎপাত শুরু হয়েছে।"

শশীমুখী বললেন, "তাই তো! কথাটা তো আমার খেয়াল হয়নি। দাড়া, আজই লোকটাকে বেঁটিয়ে তাড়াব।"

মূর্ছনাদেবী আর্তনাদ করে বললেন, "না না দিদি, ওসব করতে যেয়ো না। ভূত-প্রেত নিয়ে যারা ঘোরে তারা অনেক কিছু করতে পারে। শেষে হিতে বিপরীত হবে যে! তার চেয়ে যাতে মানে-মানে বিদেয় নেয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।"

পাঁচটা গাঁ ঘুরলেও এক সময় রবির মতো পাকা হাতের লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। বাপ-পিতেমোর আমল থেকেই তারা ঝাড়েবংশে চোর। হামা দেওয়া অবস্থা থেকেই তার তালিম শুরু। বাবা চোর, জ্যাঠা চোর, কাকা চোর। চোরে-চোরে ধুল পরিমাণ। তবে দিনেকালে দেখা গেল, রবি তার বাপ-দাদাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। হেন দরজা বা জানলা নেই যা সে লহমায় হাট করে খুলতে পারে না। এমন বাক্স বা লোহার সিন্দুক নেই যা খুলে ফেলতে তার তিন মিনিটের বেশি সময় লাগে। ভাল চোরের আর-একটা লক্ষণ হল, আগাম খবর রাখা। যেমন-তেমন বাড়িতে ঢুকে ছিচকে চুরি করলে খাটুনিতে পোষায় না। রবি কখনও ছোটখাটো কাজ করেনি। তক্কেতক্কে থেকে, নানা সূত্রে খবর নিয়ে বরাবর ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছে।

ফলে নীচের মহলে রবির নাম ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি। বিশ বছর বয়সেই সে দামি সাইকেল কিনে ফেলল। বাড়িতে রেডিয়ো আনল। মাকে গরদের শাড়ি দিয়ে পুজোর সময় প্রণামও করে ফেলল। রবির হাতযশে সকলেই বেশ খুশি। তার তিরিক্ষি মেজাজে বাপ পর্যন্ত তার সঙ্গে হুশিয়ার হয়ে কথা বলতেন।

শুধু তার স্কুলের মাস্টার ব্রজবিলাসবাবু তাকে মাঝে-মাঝে স্মরণ করিয়ে দিতেন, "ওরে রবি, কত বড় একজন মানুষের নামের সঙ্গে তোর নাম জড়িয়ে

আছে বাবা, কথাটা কিন্তু ভুলিস না। নামের মর্যাদা রাখিস।”

“তা কী করব মাস্টারমশাই? পদ্য লিখব, না দাড়ি রাখব?”

“আরে না না, ওসব তোকে করতে হবে না। শুধু রবীন্দ্রনাথ নামটা খেয়াল রাখতে বলছি। তুই যে-সে মান্না নোস, রবীন্দ্রনাথ মান্না এটা মনে রাখলেই হবে।”

“তা মা-বাপ যদি আমার একটা ভুল নাম রেখেই থাকেন, তা হলেই বা আমার কী করার আছে বলুন!”

“ওরে, তোকে কিছু করার কথা বলিনি, বরং না-করার কথাই বলছি। রবীন্দ্রনাথ যা-যা করে গিয়েছেন তা যদি না-ও পেরে উঠিস বাবা, তা হলে অন্তত রবীন্দ্রনাথ যা-যা করেননি সেগুলো করতে যাসনি। ওটুকু বুঝে চলতে পারলেই যথেষ্ট।”

কথাটার মধ্যে একটা লাটুর মতো প্যাঁচ ছিল। বুদ্ধিমান রবি সেটা ধরতেও পারল। কিন্তু নাম-পুজো করলে যে পেট-পুজোয় টান পড়বে, এটাও তো সত্যি!

এর পর যখন সে বিয়ে করল, তখন তার পিছনে লাগল বউ পটলরানি। রোজ ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল, “ওগো, তুমি চুরিটুরি ছেড়ে দাও। ওসব পাপ আর কোরো না। আমি চোরের বউ হয়ে জীবন কাটাতে চাই না। তার চেয়ে ভিক্ষে করা ভাল।”

শুনে ভারী রেগে যেত রবি। বলে কী রে মেয়েটা? সে বুক চিতিয়ে বলত, “আরে। আমি কি হ্যাতা-ন্যাতা চোর নাকি? পাচটা গাঁ ঘুরে এসো তো, তল্লাটের সব চোর আমার নাম শুনে কপালে হাত ঠেকায় কি না দেখে এসো। আমার কত নামডাক, কত খাতির তা জানো?”

পটলরানি চোখের জল ফেলে বলত,“অমন নামডাকের মুখে ছাই। আমার আমন নামডাকের দরকার নেই। শাক-ভাত, নুন-ভাত খাব, তবু হকের পয়সায় খাব, চুরির পয়সায় নয়।”

দু’-দু’বার রাগ করে পটলরানি বাপের বাড়িও চলে গিয়েছিল। তাও হয়তো রবি চুরি ছাড়ত না। কিন্তু শেষ অবধি বোধ হয় ব্রজবিলাসবাবু আর পটলরানির অভিশাপেই ছাড়তে হল। সে ভারী লজ্জার ঘটনা। এক রাতে যন্ত্রপাতির থলি নিয়ে সবে বেরিয়েছে, এমন সময় পাঁচ-সাতজন মুশকো লোক চারদিক থেকে এসে তাকে জাপটে ধরে বেঁধে ফেলল। তারপর টানতে টানতে শ্মশানেশ্বরী কালীমন্দিরের চাতালে নিয়ে ফেলল। লোকগুলোকে ভালই চেনে রবি। চত্বরের যত চোর আর ডাকাত। রবির হাতযশের ফলে এদের ইদানীং হাড়ির হাল হয়েছে। যে বাড়িতেই ঢোকে সেই বাড়িতেই রবি আগে ঢুকে জিনিসপত্র সাফ করে ফেলেছে। তাই সবাই মিলে মিটিং করে ঠিক করেছে, কালীর সামনে রীতিমতো মন্ত্রপাঠ করে তাকে বলি দেবে।

প্রাণের ভয়ে রবি বিস্তর কান্নাকাটি করেছিল। তার যে এমন পরিণতি ঘটতে পারে সেটা সে আন্দাজ করেনি। শেষে জৌ গ্রামের প্রবীণ মানুষ পাঁচুগোপাল মধ্যস্থ হয়ে বলল, “এর বয়স কম, ঘরে কচি বউ আর বিধবা মা আছে। ওর কাছ

থেকে মুচলেকা নিয়ে বরং একটা সুযোগ দাও তোমরা। আবার যদি চুরিতে নামে তখন আর ছাড়া হবে না।”

মুচলেকা নয়, তাকে মা কালীর পা ছুঁয়ে শপথ করতে হয়েছিল যে, জীবনে আর চুরি করবে না।

প্রাণে বেঁচে ফিরে এল রবি। পরদিন থেকে আর চুরি করতে বেরোত না। চুরি ছেড়েই দিল সে। কিন্তু কেন ছাড়ল সেটা আর লজ্জায় কারও কাছে প্রকাশ করতে পারত না।

রবি রাতে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয় দেখে তার মা বিন্ধ্যবাসিনী আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। একদিন সকালবেলা তাকে ধরে বললেন, “ও বাবা রবি, তুই যে বড় রাতের বেলা নাক ডাকিয়ে ঘুমোস! কাজকর্ম যে লাটে উঠবে বাবা!”

রবি গম্ভীর হয়ে বলল, “আমি চুরি ছেড়ে দিয়েছি মা!”

বিন্ধ্যবাসিনী বিস্ময়ে হাঁ, “কী সব্বোনেশে কথা! চুরি ছেড়েছিস মানে? তোরা হলি ঝাড়েবংশে চোর। কুলধর্ম ছেড়ে দেওয়া যে মহাপাতক! লক্ষ্মী কুপিতা হবেন, পূর্বপুরুষের আত্মা অভিশাপ দেবে। কুলধর্ম কি ছাড়তে আছে বাবা? বংশমর্যাদার কথাটা কি ভুলে গেলি? শেষে বাপ-দাদার নাম ডোবাবি নাকি হতভাগা? ওসব কথা বলতে নেই বাবা, পাপ হয়!”

বিন্ধ্যবাসিনীকে আর বোঝানোর চেষ্টা করেনি রবি। হাতে যা টাকাপয়সা ছিল আর পটলরানি স্বেচ্ছায় তার গয়না খুলে দেওয়ায় তা দিয়ে সে বাজারে একখানা চা-মিষ্টির দোকান দিল।

দোকান খুব একটা খারাপ চলে না। কষ্টেসৃষ্টে রবির সংসার চলে যায়। বিন্ধ্যবাসিনী রোজই দু ঘন্টা ধরে নিয়মিত বিলাপ করেন বটে, কিন্তু পটলরানি খুব খুশি।

রবি যে খুব সুখে আছে তা বলা যায় না, তবে অবস্থাটা তাকে মেনে নিতে হয়েছে।

শীতকালে সন্ধের পর দোকানে আর খদের থাকে না। উনুনের পাশটিতে চৌকিতে বসে হ্যারিকেনের আলোয় রবি বিকিকিনির হিসেব লিখছিল। এমন সময় দুটো অচেনা লোক এসে বেঞ্চে বসল। লম্বামতো লোকটা বলল, "চা হবে?"

রবি বলল, "দুধ নেই। লাল চা হতে পারে।"

“চলবে। খুব গরম দু’কাপ চা দাও তো।”

ফটিক তার কাজের লোক। তাকে দু’কাপ চা করতে বলে রবি আড়চোখে লোক দুটোকে লক্ষ করল। অপরাধ জগতের লোকজন চিনতে তার বড় একটা ভুল হয় না। তবে কিনা সে আজকাল আর সাতে-পাঁচে থাকে না।

চা খেতে খেতে একজন তাকে জিজ্ঞেস করল, “ওহে দোকানি, একজন বুড়োমতো মানুষকে দেখেছ? বছর ষাট-বাষট্টি বয়স, মজবুত চেহারা, খোঁচা-খোঁচা চুল?”

রবি একটু উদাস গলায় বলল, “কত লোকই তো আসছে-যাচ্ছে!”

লোকটা ঠান্ডা করে বলল, “ওরে বাপ রে! গোপালহাটি আবার এত তালেবর জায়গা কবে হল যে, বাইরের লোক বেড়াতে আসবে?”

রবি একটু হেসে বলল, “তা গোপালহাটি খুব ফ্যালনা জায়গাও নয়। এখানে নীলকুঠি আছে, পুরনো গির্জা আছে, জনসাহেবের কবর আছে। শুনেছি রাজা কুম্ভের মিনারও ছিল। আগে গোপালহাটিতে লোকে বেড়াতেও এসেছে মশাই।”

বেঁটে লোকটা বলে উঠল,“জন সাহেবের কবর! জনসাহেবটা কে?”

রবি মাথা নেড়ে বলল, “তা জানি না। শুনেছি, সাহেব খুব ভাল মানুষ ছিলেন।”

“এ গাঁয়ের কি আগে অন্য কোনও নাম ছিল দোকানি?”

“ছিল বোধ হয়। আমার ঠাকুরদার আমলে এ গাঁ’কে অনেকে আছাপুর বলত বলে শুনেছি।”

লোক দুটো কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বেঁটেজন নিচু গলায় বলল, “আছাপুর মানে আর্চারপুর নয় তো রে নিতাই?”

লম্বাজন অর্থাৎ নিতাইও নিচু গলায় বলল, “হতেই পারে, বোধ হয় গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে নামটা আছাপুর হয়ে গিয়েছে।”

“তা হলে কি ঠিক জায়গাতেই এসেছি বলছিস?”

“অত নিশ্চয়ই করে বলি কী করে বল? বটু সর্দার যদি গন্ধে গন্ধে এখানে এসে থাকে, তবে ধরে নিতে হবে, এটাই সেই জায়গা। আরও একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার। লোকটা তো আর হাওয়া হয়ে যেতে পারে না!”

কথাগুলো এমন নিচু গলায় বলা যে, রবির শুনতে পাওয়ার কথাই নয়। কিন্তু যখন চুরি করত তখন রবি নিজের নাক, কান আর চোখকে সজাগ রাখার বিদ্যে শিখেছিল। লোকের ঠোঁট নড়া দেখে কথা আন্দাজ করতেও সে ছিল ওস্তাদ। নইলে লোকের হাড়ির খবর জানবে কী করে?

বেঁটেজন রবির দিকে চেয়ে বলল, “ওহে দোকানি, আমরা যার খোঁজে বেরিয়েছি, তিনি আমার বাবা। একটু মাথার দোষ আছে। হুটহাট মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে যান। একটু ভাল করে ভেবে দ্যাখো তো, মাঝারি লম্বা, বেশ গাট্টাগোট্টা চেহারার ষাট - বাষট্টি বছর বয়সি কাঁচা-পাকা খোঁচা-খোঁচা চুলওয়ালা একজন বুড়ো মানুষকে এই অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছ কি না?”

রবি খুব দেখেছে। শুধু দেখাই বা কেন, বটু সর্দারের সঙ্গে গতকালও কত সুখ-দুঃখের কথা হল। একসময় বটুর কাছে কিছুদিন তালিম নিয়েছিল রবি। সেসব কথাও হচ্ছিল। তবে হঠাৎ গোপালহাটিতে তার আগমন কেন সেটা বটু সর্দার ভেঙে বলেনি। রবি জানে যে, বটু মোটে বিয়েই করেনি, তার ছেলেপুলে হওয়ার কথাও ওঠে না।

রবি ভালমানুষের মতো মুখ করে বলল, "এ গাঁয়ে নতুন লোক এলে জানতে পারব না, তা কি হয় মশাই? আপনার বাবা এ গায়ে আসেননি।"

নিতাই বেঁটেজনের দিকে চেয়ে নিচু গলায় বলল,"লোকের কথায় বিশ্বাস নেই রে পানু। হুঁশিয়ার থেকে নজর রাখতে হবে।"

বেঁটে লোকটা অর্থাৎ পানু ফের রবির দিকে চেয়ে বলল, "আচ্ছা, জনসাহেবের কবরটা কোন দিকে বলতে পারো?"

রবি উদাস গলায় বলল, "বলতে পারব না কেন? এখানেই আমার জন্মকর্ম, এত বছর এখানেই কাটিয়ে দিলাম, আর জনসাহেবের কবর কোথায় তা জানব না?"

"তা তো বটেই হে দোকানি। তা ভাবছিলাম, এসেই যখন পড়া গিয়েছে তখন জনসাহেবের কবরটা একবার দেখেই যাই।"

"তা বেশ তো! গা ছাড়িয়ে পুব দিকে বেশ খানিকটা এগোলে কালিন্দীর জঙ্গল পাবেন। বেশ ঘন জঙ্গল, কাঁটা-ঝোপটোপ আছে। সাপখোপও মেলা। ভাঙা গির্জার চাতাল ছাড়িয়ে খানিক এগোলেই ঝোপঝাড়ের আড়ালে জনসাহেবের কবর খুঁজে পাবেন। আজকাল আর কেউ তেমন যায় না বলে আগাছা হয়ে কবর ঢাকা পড়ে গিয়েছে। খুঁজে বের করা শক্ত হবে।"

পানু একটু হেসে বলল, "শক্ত কাজ করতেই আমরা পছন্দ করি। তুমি বেশ ভাল লোক হে দোকানি, অনেক খবর-টবর দিলে।"

রবি ঠোঁট উলটে বলল, "কোথায় আর দিলাম? আপনার হারানো বাবার খবরই তো দিতে পারলাম না।"

পানু বলল, "বাবার জন্য তেমন চিন্তা নেই। মাথা-পাগলা লোক তো! মাঝে মাঝে হারিয়ে যান বটে, কিছুদিন পর আবার ফিরেও আসেন। তবে যতদূর জানি, এখানে তিনি ঠিকই আসবেন। এলে একটু খবরটা দিয়ো। বাড়ির সবাই বড্ড উচাটন হয়ে আছে।"

"তা খবরটা দেব কোথায়?"

"আমরা আশপাশেই কোথাও থাকব। মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যাব'খন।" বলে চায়ের দাম দিয়ে দু'জনেই উঠল। দু'জনের কাধেই একটা করে বড়সড় ব্যাগ। রবির অনুমান হল, ওই দুটির মধ্যে স্লিপিংব্যাগ বা ছোট তাবু গোছের কিছু আছে।

বটু সর্দার কী জিনিস দিয়ে তৈরি তা যদি তাকে কেউ জিজ্ঞেস করে, তবে রবি বলতে পারবে না। কখনও মনে হয়, হাওয়া-বাতাস দিয়ে তৈরি। কখনও মনে হয়,

স্রেফ রবার। আবার কখনও বা মনে হয়, বুঝি লোহার মুষল। পানু আর নিতাই কেন বটু সর্দারকে খুঁজছে তা রবি অবশ্য জানে না। কিন্তু খুব ভাল উদ্দেশ্যে যে খুঁজছে না, সেটা আন্দাজ করা শক্ত নয়। ভয় হল, বটু সর্দার যতই যোগ-প্রক্রিয়া জানুক, বা যতই বুদ্ধি ধরুক, বন্দুক-পিস্তলের সঙ্গে তো আর পেরে উঠবে না? পানু আর নিতাইয়ের ব্যাগের মধ্যে ওসব জিনিস থাকা বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে বটু সর্দারের সমূহ বিপদের আশঙ্কা।

দোকান বন্ধ করে রবি বাড়ি যাওয়ার পথে একটু ঘুরে রায়বাড়ির পিছন দিক দিয়ে গিয়ে একটা বিশেষ জানলায় খুব মৃদু তিনটে টোকা দিল। কিছুক্ষণ পর ফের একটা।

জানলাটা নিঃশব্দে একটু ফাঁক হল। ফাঁকে খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা একটা মুখ।

"পানু আর নিতাই আপনাকে খুঁজছে।"

"হুঁ।"

"জনসাহেবের কবরেরও খোজ হচ্ছে।"

বটু সর্দার নির্বিকার গলায় বলল, "সেরকমই তো হওয়ার কথা, না হলেই আশ্চর্যর ব্যাপার ছিল। এইটুকু থেকে শিখিয়ে-পড়িয়ে লায়েক করে দিলুম, সে কি আর আহাম্মকি করতে পারে? করলে ভাবতুম, আমার শিক্ষেটাই বৃথা গিয়েছে।"

"কে? কার কথা বলছেন বলুন তো!"

বটু মিটমিট করে চেয়ে বলল, "নিতাইয়ের কথাই তো হচ্ছে।"

"তা সে যদি আপনারই চেলা, তা হলে আর ভাবনা কী? আমি তো ভাবলুম, সে অন্য কোনও মতলবে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"তা তো খুঁজছেই। তার ভয়েই তো গা ঢাকা দিয়ে আছি।"

"তবে যে বললেন, এইটুকু বয়স থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে লায়েক করেছেন?"

"তা তো করেছিই। ফুটবল খেলা দেখিসনি?"

"তা দেখব না কেন?"

"ধর, দুটো ভাই দু দলে খেলছে। তা ভাই বলে কি একজন আর-একজনকে ছেড়ে কথা কইবে? নিতাইয়ের সঙ্গে এখন আমার সেই সম্পর্ক।"

"তা আপনাকে পেলে নিতাই কী করতে চায়?"

"সে আর শুনতে চাসনি। রাতের ঘুম নষ্ট হবে। বাড়ি যা।"

"আর-একটা কথা শুনেই চলে যাব। নিতাইকে পেলে আপনি কী করবেন?"

বটু মিটমিট করে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বলল,"আমার কিছু করার নেই।"

"তবে কি মরবেন?"

বটু নির্বিকার গলায় বলল, "আমাকে না মেরে নিতাইয়ের উপায় নেই কিনা।"

"আপনি খুব গোলমেলে লোক।"

"কেন বল তো?"

“নিতাই আপনাকে মারতে চায় জেনেও কেন যেন হেলদোল নেই আপনার।”

বটু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “বিকিকিনি শেষ হলে দোকানদাররা দোকানের ঝাপ ফেলে দেয়! তাই না?”

“তা তো দেয়ই। আপনারও কি ঝাপ ফেলার সময় হয়েছে?”

এবার একটু হাসল বটু। তারপর বলল, “ঠিক ধরেছিস। অনেক চোর-ছ্যাচোড় তৈরি করেছি, পাপটাপও বড় কম জমেনি, বুঝলি!”

“আর-একটা কথা, জনসাহেবের কবর নিয়ে কথা উঠছে কেন?”

“উঠছে নাকি? তা উঠলে আমি কী করব?”

“তার মানে আপনি বলবেন না?”

“সব গুহ্যকথা জেনে তোর হবেটা কী? যত জানবি তত বিপদ। বিপদ-আপদকে কি ডেকে এনে পিঁড়ি পেতে বসাতে আছে?”

“জনসাহেবের কবরের কথা আমিই নিতাই আর পানুকে বলেছি। কাজটা ভুল হল কি না বুঝতে পারছি না।”

নির্বিকার গলাতেই বটু বলল, “তুই না বললেও আর কেউ বলত। তুই কিছু ভুল করিসনি।”

চার

“বাজার!” বলে একটা আর্তনাদ করে বিজয়বাবু হাঁ হয়ে গেলেন।

গুরুপদ দু’খানা ভাঁজ করা বাজারের ব্যাগ বিজয়বাবুর শিথিল হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল,“হ্যাঁ মেজদা, বাজার।”

বিজয়বাবু হঠাৎ সোজা হয়ে বসে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বললেন,“আমি করব বাজার? আমাকে বাজারে যেতে বলিস, তোর এত সাহস?”

গুরুপদ সভয়ে দু’পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, “আহা, আমি তোমাকে বাজার করতে বলব কেন?”

“এই যে বললি? জীবনে কখনও বাজারে গেলুম না, আর এখন তুই আমাকে বাজারে যাওয়ার হুকুম করিস?”

“আমি বলছি না তো! আমি বলতে যাব কোন দুঃখে? এ আমার বলা নয়, আমাকে দিয়ে বলানো হয়েছে মাত্র।”

“কে? কার এত সাহস?”

“বড়বউদি আর মেজোবউদি।”

বিজয়পদ চোপসানো বেলুনের মতো হয়ে গিয়ে ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, “তা সেটা আগে বলতে হয়। কিন্তু আমাকে তারা বাজারে পাঠাতে চায় কেন জানিস?”

“কাল রাতে বাড়িতে বউদিরা মিলে মিটিং করেছে। তাদের মত হল, তোমার কোনও এক্সারসাইজ হচ্ছে না, তুমি দিনদিন অলস আর ঘরকুনো হয়ে যাচ্ছ। গ্রন্থকীট হওয়ার ফলে তোমার বস্তুজ্ঞান লোপ পাচ্ছে এবং তুমি আজকাল প্রায়ই ভূত দেখছ। ফলে আজ থেকে তোমার রুটিন পালটে ফেলতে হবে। বাইরের খোলা হাওয়া-বাতাসে ঘুরে বেড়াতে হবে, বাজার-হাট করতে হবে, লোকের সঙ্গে মেলামেশা বাড়িয়ে দিতে হবে।”

বিজয়বাবু কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, “লিস্টিতে আর কিছু নেই? এভারেস্টে ওঠা বা ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া!”

“পরে হয়তো সেসব নিদানও দেওয়া হবে। আজ বাজার দিয়ে শুরু।”

বিজয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে করুণ গলায় বললেন, “বাজারটা কোন দিকে যেন?”

“পুব দিকে।”

“অ। তা সে না হয় হল! কিন্তু হ্যাঁ রে, বাজার কীভাবে করতে হয় জানিস?”

“তা জানব না কেন?”

“তা হলে তুইও না হয় সঙ্গে চল।”

“আমার ঘাড়ে একটা বই দুটো মাথা তো নেই মেজদা।”

“তা বটে।”

গুরুপদ অভয় দিয়ে বলল, "ভয়ের কিছু নেই, ফর্দ ধরে বাজার করলেই হবে। লাউ, কুমড়ো, পালংশাক, ধনেপাতা, বেগুন, উচ্ছে, নিমপাতা, আলু, টম্যাটো, পোনামাছ আর হাসের ডিম।"

"ওরে বাবা! এত খাওয়া কি ভাল?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিজয়বাবুকে উঠতে হল। তিনি কখনও যুদ্ধে যাননি বটে, কিন্তু আজ মনে হয়, সেটাও এমন কিছু নয়। বাজারে চোর, জোচ্চোর, পকেটমার ঘুরে বেড়ায়, দর বেশি হাকে, ওজনে ফাকি দেয়, পচা জিনিস গছিয়ে দেয়। কী করে সব দিক সামলাবেন সেই দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে দুরুদুরু বক্ষে তিনি বাজারে
রওনা হয়ে পড়লেন।

বাড়ির কাছেই মোড়ের মাথায় ভবেন রক্ষিতের সঙ্গে দেখা।

"কে রে, বিজয় নাকি? বাজারে যাচ্ছিস?"

"হ্যাঁ ভবেনদা।"

"ভাল-ভাল। আমিও একটু আগেই বাজার ঘুরে এলুম কিনা! তা আজ নন্দগোপালের কাছে ভাল বেগুন পাবি। একেবারে কাশীর বেগুনের মতো স্বাদ। ধনঞ্জয় টাটকা লাউ পেড়ে এনেছে। সুকুমারের দোকানে আলতাপাটি শিম এসেছে দেখেছি।"

আনমনে একটা হুঁ দিয়ে বিজয়বাবু দ্রুত হাটতে লাগলেন। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। একটা ধন্দ-ধন্দ ভাব। প্রথম বাজারে গেলে বোধ হয় এরকমই হয়।

আলুর দোকানে শিবেন ধর উবু হয়ে বসে আলু বাছছেন দেখে বিজয়বাবুর ধড়ে প্রাণ এল। শিবেন ধর বিষয়ী লোক। ঝুপ করে তার পাশে বসে পড়ে বিজয়বাবু বললেন, "আলু নিচ্ছেন বুঝি শিবেনবাবু?"

"হ্যাঁ। তা আপনিও নেবেন বুঝি? ওই লালচে লম্বা ছাদের আলুগুলো বেছে তুলুন। ওগুলো খাটি নৈনিতাল। খবরদার, চার টাকার বেশি দর দেবেন না।"

বিজয়বাবুর ভারী সুবিধে হয়ে গেল। ফুলকপি কিনতে গিয়ে একটু বিভ্রাটে পড়েছিলেন। কালু মোদক এগিয়ে এসে বলল, "আহা, ওগুলো নয়! গোড়ার দিকটা একটু সরু মতো দেখে নিন। ওগুলোর সোয়াদ খুব। দিশি জিনিস তো, সঙ্গে কড়াইশুটি নিতে ভুলবেন না। ওই অমর আজ টাটকা কড়াইশুটি এনেছে।"

বেশ ভালই লাগছে বাজার করতে তার। বাজার-ভর্তি এত চেনা লোককে পেয়ে যাবেন তা তো আর জানতেন না!

মাছের বাজারে গিয়ে মাছের একটা টুকরো প্রায় পছন্দই করে ফেলেছিলেন। ঠিক এই সময় গোপেন বিশ্বাস কোথেকে উদয় হয়ে বলল, "আহা, করো কী হে বিজয়? ওটা যে শতবাসি মাছ। ওই ফুলেশ্বর টাটকা পোনা মাছটা সবে কেটেছে। যাও-যাও, সের দুই কিনে ফ্যালো গে।"

অতি সুষ্ঠুভাবেই বাজার করছেন বিজয়বাবু, কিন্তু সেই অস্বস্তিটা কিছুতেই যাচ্ছে না। বারবারই মনে হচ্ছে, একটা কীসের যেন হিসেব মিলছে না। একটা বেশ গোলমাল হচ্ছে! কিন্তু কীসের গোলমাল তা ধরতে পারছেন না।

একজন মুটের হাতে বাজারপত্র চাপিয়ে বাজার থেকে বেরোতে যাবেন, সর্বেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা।

"বাজার হল বুঝি?"

"যে আজ্ঞে, পণ্ডিতমশাই।"

"তোকে একটা কথা অনেকদিন ধরে বলব-বলব করছি, বলা হয়ে উঠছে না।"

"কী কথা পণ্ডিতমশাই?"

"আহা, ওই বাইবেলটার কথা। জনসাহেবের সেই হিব্রু ভাষার বাইবেল। যদিও ম্লেচ্ছ জিনিস, তবু ওটা আগলে রাখিস। ওটার এখন অনেক দাম।"

বিজয়বাবুর মোটে খেয়ালই ছিল না। ঠিক বটে। তাঁদের বাড়িতে অনেক বইয়ের মধ্যে একটা হিব্রু ভাষার পুরনো বাইবেলও আছে বটে। শোনা যায়, জনসাহেবের নাতি বইখানা তার দাদুকে দিয়েছিল।

বিজয়বাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, "অনেক দাম?"

সর্বেশ্বর বললেন, "তাই তো শুনি। ওই বাইবেলের মধ্যে নাকি গুপ্তধনের সন্ধান আছে।"

বিজয়বাবু বিস্মিত। হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

"কিছু লোক বাইবেলটা হাত করার জন্য ঘুরঘুর করছে বাপু একটু হুঁশিয়ার থাকিস।"

"যে আজ্ঞে।" বলে চিন্তিত বিজয়বাবু বাড়িমুখো হাঁটতে-হাঁটতে ফের অস্বস্তিটা বোধ করছিলেন। কী যেন একটা গরমিল হচ্ছে। কেমন যেন একটু ধাধামতো ভাব হচ্ছে! অথচ পকেটমার হয়নি! বিশেষ ঠকেও যাননি। কারও সঙ্গে কথা-কাটাকাটি বা অশান্তি হয়নি। অথচ এরকম হচ্ছে কেন?

মুটে ছেলেটা তাঁর পিছু-পিছু আসছিল। হঠাৎ বলল, "আচ্ছা বাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"কী কথা রে?"

"আপনি একা-একা কথা বলেন কেন?"

"একা-এক কথা বলি? দূর পাগল, কখন আমাকে একা-একা কথা বলতে দেখলি?"

জোরে-জোরে কথা বলছিলেন। এই যে একটু আগে বললেন, 'যে আজ্ঞে পণ্ডিতমশাই'। তারপর বললেন, তাই নাকি পণ্ডিতমশাই'। সবাই বলছিল বাবুটা পাগলা আছে।"

বিজয়বাবু রেগে একটা ধমক দিতে গিয়েও হঠাৎ বজ্রাহত হয়ে দাড়িয়ে পড়লেন। তাই তো! সর্বেশ্বর পণ্ডিত আসবেন কোত্থেকে? তিনি তো অন্তত পাঁচ বছর আগে... মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল বিজয়বাবুর। তাই তো! ভবেন রক্ষিত, শিবেন ধর, কালু মোদক বা গোপেন বিশ্বাস কারওরই তো বেঁচে থাকার কথা নয়। এদের প্রত্যেকের শ্রাদ্ধে তার নেমন্তন্ন ছিল।

"ভূ-ভূত। ভূ-ভূত। ভূ-ভুত।" বলে আবার হাত-পা ছড়িয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন বিজয়বাবু। লোকজন ছুটে এল। ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল তাকে। এল জল, এল পাখা।

খবর পেয়ে যতীনডাক্তারও এসে হাজির। বিজয়বাবুর প্রেশার দেখা হল, জিভ দেখা হল, চোখ দেখা হল, নাড়ি দেখা হল, বুক পরীক্ষা হল, পেট টিপে দেখা হল।

শশীমুখী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, "ভূত দেখারও তো একটা নিয়মকানুন রীতিনীতি থাকবে রে বাপু! যখন-তখন দেখলেই তো হবে না! অন্ধকার চাই, একা হওয়া চাই, নিরিবিলি জায়গা চাই! বাজার-ভর্তি একহাট লোকের মধ্যে দিনের ফটফটে আলোয়, তাও একটি-দুটি নয়, গন্ডায়-গন্ডায় ভূত দেখে নাকি কেউ? ছা-ছা, এ যে ভূতের উপর ঘেন্না ধরে গেল বাবা! ভূত যদি এমন নির্লজ্জ, আদেখলে বেহায়া হয়, তা হলে ভূতকে আর কেউ কখনও ভয় পাবে?"

মূর্ছনাদেবীও রাগ করে বললেন, "চারদিকে মনিষ্যিগুলোকে কখনও ওঁর নজরে পড়ে না, নজরে পড়ে কেবল ভূতেদের!"

এই ক'দিন আগেও বিজয়বাবু ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। ভূত বলে যে কিছু থাকতে পারে এটা কোনও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ কি বিশ্বাস করতে

পারে? তা হলে এখন এসব কী হচ্ছে? এ কি ভূত না ভুল? তার কি কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে? লজিক কাজ করছে না? ঘরভর্তি পাড়া-প্রতিবেশী আর বাইরের মানুষজন তাকে হা করে দেখছে, আর নানা কথা কইছে। লজ্জায় মুখ দেখানোর জো রইল না তার! চোখ বুজে মটকা মেরে পড়ে থাকা ছাড়া তার আর কী-ই বা করার আছে? এইভাবে দশজনের কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে বেঁচে থাকাও যে কঠিন হয়ে উঠছে তার কাছে!

যতীনডাক্তার চিন্তিভাবে বললেন,"শশমুখী বউমা ঠিকই বলেছেন। ভূত-টুত দেখার একটা আলাদা অ্যাটমস্ফিয়ার আছে। দিনেদুপুরে বাজারে ভিড়ের মধ্যে ভূত দেখাটা তো ঠিক হচ্ছে না।" নীলমণি ঘোষ বললেন, "ঘোর কলিকাল বলেই হচ্ছে। এর পর বেলা বারোটায় আকাশে তারা দেখা গেলেও আশ্চর্যের কিছু নেই।"

অভয়পদ বলল, "এসবের মূলে কি গ্লোবাল ওয়ার্মিং আর এল নিনো আছে বলে আপনার মনে হয় ডাক্তারবাবু?"

যতীনডাক্তার বিদায় হলেন। ঘরের ভিড়টাও ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে গেল। একা হওয়ার পর বিজয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ খুললেন। আর চোখ খুলেই শুনতে পেলেন, ভিতর দিককার বারান্দায় নয়নতারা শশীমুখীকে বলছেম"ও বড়দি, ভূতই দেখুন আর যা-ই দেখুন, মেজদা কিন্তু বাজারটা করেছেন ভারী ভাল! কী সুন্দর কচি লাউ এনেছেন দেখুন! আর বাজারের সেরা ফুলকপি, সরু ডাটিওয়ালা। কী ভাল বড়-বড় টম্যাটো, কচি পালং, নারকুলে বাঁধাকপি আর কড়াইশুটি!"

বাসবীও বেশ উঁচু গলায় বলল, "আর মাছটাও একদম এক নম্বর। এমন পাকা তেলালো রুই অনেকদিন আসেনি। নাঃ, মেজদার মতো এত সুন্দর বাজার কাউকে করতে দেখিনি!"

প্রশংসা শুনে বিজয়বাবুর মুখ শুকোল! সর্বনাশ! তার বাজারের সুখ্যাতি বেশি ছড়ালে যে এবার থেকে তাকেই ঠেলেঠলে রোজ বাজারে পাঠানো হবে! সেই ধকল কি তিনি সইতে পারবেন? হার্টফেল হয়ে যাবে যে!

খুব সরু গলায় পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, "বাবু!" বিজয়বাবুর বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠে পাজরে জোর একটা ধাক্কা দিল। তিনি টক করে চোখ বুজে ফেলে ককিয়ে উঠলেন, "ভূ-ভূত না না, আমি আর ভূত দেখতে পারব না বাবা। আর নয়। একদিনের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। তুমি বরং আর একদিন...।"

"বাবু, আমি লখাই!"

বিজয়বাবু মিটমিট করে তাকিয়ে দেখলেন, লখাই-ই বটে। তার বিছানার পাশে মেঝেয় বসে দাঁত বের করে হাসছে।

"হাসছিস যে বড়?"

"ভয় খেলেন তো, তাই দেখেই হাসছি।"

"না বাবু, বলছি, তেনারা তো আপনার ভালই করতে চেয়েছিলেন?"

বিজয়বাবু খিঁচিয়ে উঠে বললেন, "তা ভালটা একটু আড়ালআবড়াল থেকে করা যেত না? অমন বুক ফুলিয়ে চোখের সামনে এসে ভাল করতে হয় ? তাতে যে হার্টফেল হতে পারে, সেটাও তো ভাল করার আগে ভাবা উচিত ছিল।"

লখাই মাথা-টাথা চুলকে বলল, "তা বটে। তবে কিনা তেনাদের মতিগতি বোঝা ভারী শক্ত। কিন্তু আপনার সঙ্গে তেনাদের যে একটা ভারী কাজের কথা আছে! না বললেই নয়।"

বিজয়পদ অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে বললেন, "ওরে না না! আমি কোনও কথা-টথা শুনতে পারব না! আর দেখা-সাক্ষাতেরও দরকার নেই।"

"কিন্তু বাবু, কথাটা যে বড্ড কাজের ছিল।"

"কী কথা? অ্যাঁ? আমার সঙ্গে তাদের এত কথা কীসের?"

লখাই ফের মাথা-টাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে, আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, কী আর বলব? তবে যতদূর জানি, একটা বই নিয়ে কথা। বইখানা নাকি খুব কাজের বই।"

"বই!" বলে হঠাৎ বিজয়পদ শোওয়া অবস্থা থেকে সটান হয়ে বসে বললেন, "তাই তো! সর্বেশ্বর পণ্ডিত তো একটা বইয়ের কথাই বলেছিলেন ! হিব্রু ভাষায় ছাপা বাইবেল!"

লখাই একগাল হেসে বলল, "আজ্ঞে, সেইখানাই!"

"তার মধ্যে নাকি গুপ্তধনের হদিশ আছে?"

বিজয়পদ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললেন, "চল তো দেখি।"

লাইব্রেরি ঘরে এসে বিজয়পদ কাঠের মইখানা উত্তর দিকের দেওয়ালে একেবারে কোণ ঘেঁষে দাঁড় করালেন। কোথায় কোন বই রাখা আছে এটা তার একেবারে মুখস্থ। চোখ বেঁধে দিলেও বের করতে পারবেন।

লখাই মইখানা চেপে ধরে রইল। বিজয়পদ খুব সাবধানে মই বেয়ে উপরে উঠলেন। বাঁ ধারে পরপর দশ-বারোখানা নানা সংস্করণের বাইবেল সাজানো। বা দিক থেকে দ্বিতীয়খানাই হিব্রু ভাষার বাইবেল। কিন্তু জায়গাটা ফাঁকা!

বিজয়পদ একটা আর্তনাদ করলেন, "সর্বনাশ!"

"কী হল বাবু?"

"বইটা তো নেই!"

"বলেন কী বাবু? এঃ হেঃ, তেনারা যে ভারী নেতিয়ে পড়বেন?"

স্তম্ভিত বিজয়পদ মই থেকে নামার কথা অবধি ভুলে গিয়ে দু' হাত মাথায় দিয়ে ডুকরে উঠতে যাচ্ছিলেন। সাধারণত মইয়ের উপর উঠলে দু হাত ছেড়ে দেওয়ার নিয়ম নেই, তা যুক্তিযুক্তও নয়, বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ও নয়। সুতরাং বিজয়বাবু মইয়ের ডগা থেকে চিতপটাং হয়ে সোজা মেঝের উপর পড়তে লাগলেন। তবে একেবারে শেষ মুহূর্তে দুটো জোরালো হাত তাকে ধরে পাজাকোলে তুলে না নিলে বিপদ ছিল।

পড়ার ধকলে বিজয়পদর মাথাটা ভোম্বল হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। তারপর আবছা চোখে খোচা-খোচা দাড়িওয়ালা মুখটা

দেখে ককিয়ে উঠলেন, “ভু-ভূত। ভূ-ভূত!”

ভূতও বলতে পারেন। আমি কি আর মনিষ্যির মধ্যে পড়ি? তবে কিনা এখনও চৌকাঠটা ডিঙনো হয়নি, এই যা!”

“ও, আপনি সেই বটু সর্দার, তাই না?”

“যে আজ্ঞে। তা বাবু, অমন হস্তদন্ত হয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে কোন বইটা খুঁজছিলেন বলুন তো?”

বিজয়পদ একটু ধাতস্থ হয়েছেন। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করে বললেন, “ও একটা ইংরেজি বই।”

লোকটা ঘরের কোণ থেকে চামড়ায় বাঁধানো একটা মোটা বই কুড়িয়ে নিয়ে এসে বলল, “আজ্ঞে, আমি মুখু মানুষ। ইংরেজিও জানি না, হিব্রুও জানি না। তা দেখুন তো, এই বইটা নাকি?”

বিজয়পদ বইটা প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে উলটে-পালটে দেখে বললেন, “আরে, এই তো সেই বই! হিব্রু ভাষার বাইবেল! এটা আপনি কোথায় পেলেন?”

“আজ্ঞে, যেখানে রাখা ছিল সেখান থেকেই পেয়েছি।”

“বলেন কী? তা বইটা নামিয়েছিলেন কেন?”

“সে আর কবেন না। শুনেছিলুম, বইটার মধ্যে নাকি গুপ্তধনের একখানা নকশা আছে। তা ভাবলুম, নকশাখানা বেহাত হলে বাবুর তো বেজায় লোকসান হয়ে যাবে। তাই নকশাখানা বের করে নিয়ে গিয়ে এই একটু আগে বাজার থেকে ছাপাই করে নিয়ে এলাম।”

বিজয়পদ আঁতকে উঠে বললেন, “জেরক্স করিয়েছেন? সর্বনাশ! তা হলে তো খবরটা চাউর হয়ে যাবে?”

বটু সর্দার চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে বলল, “তা খুব একটা ভুল বলেননি। দোকানি আর তার শাগরেদ বলাবলি করছিল বটে, এটা নাকি গুপ্তধনের নকশা। তা তারাও কয়েকখানা ছাপিয়ে নিল দেখলাম।”

বিজয়বাবু দু হাতে মাথা চেপে ধরে বললেন, “হায়-হায়। সারা গায়ে যে এতক্ষণে টিটি পড়ে যাওয়ার কথা ! এমন একটা গোপন জিনিস কি বাজারের দোকানে জেরক্স করতে হয়?”

“ঘাবড়াবেন না বাবু, আসল নকশাটা বইয়ের মধ্যেই যত্ন করে রাখা আছে। হেঁ হেঁ, ওখানা তো আর হাতছাড়া করিনি!”

লখাই এতক্ষণ কথা বলেনি। এবার বলল, “হ্যাঁ বটে, বাজারের পাশ দিয়ে আসার সময় আমি ফটিককে এই নকশার ছাপাই ফিরি করতে দেখেছি। হেকে বলছিল বটে, “গুপ্তধনের নকশা, দু’ টাকা! গুপ্তধনের নকশা, দু’ টাকা!”

“কী সর্বনাশ করলেন বলুন তো?”

বটু সর্দার কাচুমাচু হয়ে বলল, “তা বাবু, বুড়ো হয়েছি, ভীমরতিই হল বোধ হয়।”

পাঁচ

দিন দুই আগে গুরুপদ বলব-বলব করে হঠাৎ বলেই ফেলল, "হ্যাঁ মশাই, আপনি যে পকেটমারি শেখাবেন বলে কথা দিলেন, তা এখন তো দেখছি আপনার মোটেই গা নেই। কেবল খাচ্ছেনদাচ্ছেন, শুয়ে-শুয়ে ঠ্যাং নাচাচ্ছেন, আর আজ না কাল বলে পাশ কাটাচ্ছেন! তা আর কবে শেখাবেন?"

একগাল হেসে বটু সর্দার বলল, "আহা, তাড়াহুড়ো কীসের? তুমি তো বাপু লোকের পকেট মেরে রোজগারপাতি করতে যাচ্ছ না?"

"তা বলে বিদ্যেটা শিখব না মশাই ? আমার যে ওইটেই নেশা।"

বটু একটু আনমনা হয়ে বলল, "বৃথা বিদ্যায় কী লাভ বলো তো বাপুঃ খামোখা শিখে সময় নষ্ট! তার চেয়ে রোজগারপাতি হয়, দুটো টাকা হাতে আসে, এমন কাজই তো ভাল!"

গুরুপদ হতাশ গলায় বলল, "সে আর আমার হওয়ার নয়।"

বটু সর্দার সোজা হয়ে বসে হঠাৎ বলল, "তা যদি ফস করে একথোক টাকা তোমার হাতে এসে যায়, তা হলে কী করতে ইচ্ছে যায় তোমার?"

গুরুপদ বিরস মুখে বলল, "সাতমন ঘিও পুড়বে না, আর রাধাও নাচবে না। ওসব ভেবে কী লাভ?"

"আহা ভাবনারও তো একটা সুখ আছে, না কি? মানুষ কি ইচ্ছেমতো সব পায়? খানিকটা পায়, আর খানিকটা ভেবে ভেবে পূরণ করে নেয়।"

"তা যদি বলেন তা হলে বলতে হয়, হাতে কিছু টাকা পেলে বেশ একটা ঝিনচাক দেখে মোটরবাইক কিনে ফেলতাম। সেইসঙ্গে একটা মনোহারি দোকান খুলে ফেলতাম, আর দেশটা একটু ঘুরেঘুরে দেখে আসতাম।"

শুনে খুব হাসল বটু। তারপর অনেকক্ষণ ধরে মাথা নেড়ে-নেড়ে কী ভেবে নিয়ে বলল, "তা সেসব তোমার হয়েই গিয়েছে ধরে নাও। কেল্লা মেরেই দিয়েছ!"

"তার মান?"

"তোমাকে বলেই বলছি। পাঁচকান কোরো না হে! বলি, গুপ্তধন বলে একটা কথা আছে, শুনেছ কখনও?"

"তা শুনব না কেন?"

"বলি হঠাৎ করে গুপ্তধনই যদি পেয়ে যাও, তা হলে কেমন লাগবে?"

"দুর মশাই, গুপ্তধন-টন পাওয়া কি সোজা নাকি? একশো দেড়শো লটারির টিকিট কিনলাম, তার একটাও লাগল না। আমাদের কি আর সেই কপাল?"

বটু মোটে দমল না। ভারী খুশিয়াল গলায় বলল, "অত হাল ছেড়ে দিয়ো না হে! গুপ্তধনের একটা পাকা খবর আছে বলেই বলছি। কপালটা তোমার বোধ হয় তেমন খারাপ নয়।"

“খবরটা যদি পাকাই হয়, তা হলে আপনি হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন কেন? গুপ্তধন তো নিজেই দখল করতে পারতেন?”

বটু উদাস হয়ে বলল, “তা পারতাম। তবে লাভ কী বলো? আমারটা খাবে কে?”

“তার মানে গুপ্তধন পেলে আপনি তার ভাগও চান না?”

একগাল হেসে বটু বলল, “তা চাই না বটে, তবে একজোড়া নতুন জুতো, চুল ছাঁটার পয়সা আর সকালে একদিন ইচ্ছেমতো জিলিপি হলেই চলবে।”

“আপনি বড় গোলমেলে লোক মশাই! খোলসা করে বলুন তো!”

“কথাটা একটু একটু করে ভাঙলে বেশ একটু গা ছমছম ভাব হয়। তাই না?”

“আমার মোটেই তেমনটা হচ্ছে না। ঝেড়ে কাশুন তো মশাই!”

“তোমার তো ওইটাই দোষ ! সব ব্যাপারেই তাড়াহুড়ো। ওরে বাপু, কথা জিনিসটা হল বিস্কুটের মতো। অল্প অল্প করে ভেঙে খেতে হয়। তবে না স্বাদ-সোয়াদ টের পাবে। হালুম-খালুম করে গিলতে গেলে যে গলায় আটকায়!”

“আপনি বড়ই গোলমেলে লোক! তখন থেকে ঝোলাচ্ছেন।”

“আচ্ছা আচ্ছা বাপু, বলছি!” বলে বালিশের তলা থেকে একখানা চামড়ার মোটা বই বের করে গুরুপদকে দেখাল বটু।

“ওটা কী?”

“এই হল হিব্রু ভাষায় লেখা একখানা বহু পুরনো বাইবেল।”

“কোথায় পেলেন?”

“যেখানে ছিল সেখানেই পেয়েছি বাপু! অত কথায় কাজ কী?”

“তা বাইবেল দিয়ে হবেটা কী?”

“আহা, ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এটা শুধু বাইবেল নয়, সোনার খনি।”

বটু বইখানা খুব সাবধানে খুলে পাতার ভিতর থেকে একটা ভাজ করা তুলট কাগজ বের করে আনল। ভারী যত্ন করে কাগজটার ভাজ খুলে গুরুপদর সামনে তুলে ধরে বলল, “এবার দ্যাখো।”

গুরুপদ দেখল, বহু পুরনো, কীটদষ্ট কাগজটায় একটা আবছা নকশা। বেশ কাঁচা হাতের কাজ। কাগজের উপর পেনসিল দিয়ে লেখা, ‘দি ট্রেজার্স অফ জন আচার’। সে উত্তেজিত গলায় বলল, “কোথায় এটা?”

বটু বলল, “ব্যস্ত হোয়ো না বাপু! জন আর্চারের বাড়ি বেশি দূরে নয়।”

গুরুপদ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বলল, “জনসাহেবের কবর। এ সেই জনসাহেবের গুপ্তধন নাকি?”

বটু নির্বিকার গলায় বলল, “তা তো বটেই!”

গুরুপদ নকশাখানা হাতে নিয়ে বেশ ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল। কাঁচা হাতের কাজ হলেও নকশাটা বিশেষ জটিল নয়। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। জন আচারের বাড়ির দক্ষিণের কোণে বড় শয়নকক্ষের নীচে মাটির তলায় তার সব ধনরত্ন পোতা আছে। গুরুপদ সোজা হয়ে বলল, “তা হলে আমরা দেরি করছি কেন?”

"এক্ষুনি বেরিয়ে পড়লে হয় না?"

"দুর পাগল, দিনে-দুপুরে ওসব করতে গেলে বিপদ! পাঁচজনের নজরে পড়বে। পাঁচটা কথা উঠবে। আজ রাত বারোটার পর দু'জনে বেরোব'খন।"

"কী কী লাগবে ?"

"দু'খানা শাবল আর একখানা হারিকেন।"

"বড় বস্তা-টস্তা নিতে হবে না?"

বটু অবাক হয়ে বলল, "বস্তা? বস্তা দিয়ে কী হবে?"

"ধনরত্ন ভরে আনতে হবে না?"

বটু মাথা চুলকে বলল, "তা বটে।"

সারাদিনটা ভারী উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেল গুরুপদর।

রাত বারেটার পর জনসাহেবের জঙ্গলে-ঘেরা বাড়ির ধ্বংসস্তূপের সামনে যখন দু'জনে পৌঁছোল, তখন হাড়কাপানো শীত আর কুয়াশা। হারিকেনের মলিন আলোয় কিছুই তেমন ঠাহর হওয়ার উপায় নেই।

গুরুপদ বলল, "একটা টর্চ আনলে বড় ভাল হত মশাই!"

"আরে না। গতকাল এসে আমি জায়গাটা আন্দাজ করে গিয়েছি।"

ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে অতিকষ্টে দু'জন পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল। এক জায়গায় হঠাৎ দাড়িয়ে বটু সর্দার হাত তুলে একটা ইশারা করল।

গুরুপদ উত্তেজিত গলায় বলল, "এইটাই কি সেই শোওয়ার ঘর?"

"হুঁ।"

ভাঙা ইট-কাঠ সরিয়ে একটা বিশেষ জায়গায় শাবল মারল বটু। চাপা গলায় বলল, "ওপাশ থেকে তুমিও লেগে পড়ো হে! সময় নেই।"

খুঁড়তে বেশি মেহনত করতে হল না। নরম ঝুরঝুরে মাটি। বটু সর্দার মাঝে-মাঝেই খোড়া থামিয়ে উৎকর্ণ হয়ে কী যেন শোনার চেষ্টা করছে, আর মাঝে-মাঝে পশ্চিমের দিকে তাকাচ্ছে।

গুরুপদর উৎসাহ বেশি। সে প্রবল বিক্রমে মাটি সরাতে সরাতে হঠাৎ চকচকে একটা জিনিস দেখতে পেয়ে সেটা তুলে আনল। বেশ ভারী এবং বহুকালের পুরনো একটা মোমদানি।

"এটা কি সোনার জিনিস নাকি মশাই?"

বটু অন্যমনস্ক গলায় বলল, "হতেও পারে!"

গুরুপদ সোৎসাহে খুঁড়তে থাকল আর মাটি সরাতে থাকল। এর পর উঠল একটা রেকাবি, একটা জং-পড়া তলোয়ার। একটা বন্ধ হয়ে যাওয়া ট্যাকঘড়ি, তামার হাড়ি, সোনালি রঙের একটা ক্রুশ, দু'খানা জং-ধরা পিস্তল। গুরুপদর শরীরে দুনো বল এল। সে দ্বিগুণ বেগে খুঁড়তে লেগে গেল।

হঠাৎ বটু বলে উঠল, "আর নয় হে, এবার গা ঢাকা দিতে হচ্ছে।"

"তার মানে? এই তো সবে শুরু।"

"বাপু হে, পণ্ডিতরা বলেছেন, বিপদকালে অর্ধেক ত্যাগ করতে হয়।"

“দূর মশাই, এখনও তো মোহরের কলসি-টলসি ওঠেনি। অর্ধেক ত্যাগ করার কথা ওঠে কীসে?”

বটু কথা না বাড়িয়ে তার নড়া ধরে একটা হ্যাচক টানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল,“ছোটো!”

গুরুপদ গাইগুই করতে যাচ্ছিল। ঠিক এই সময় পশ্চিম দিক থেকে কড়াৎ করে একটা শব্দ শোনা গেল। একটা গুলি শিসের শব্দ করে পাশের জারুল গাছটার ডালে বিঁধে গেল। গুরুপদর আর আপত্তি হল না। “বাপ রে!” বলে সে বটুর পিছু-পিছু ছুটতে লাগল।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে একটা অশ্বত্থগাছের আড়ালে দাড়িয়ে দু’জনে চেয়ে দেখল, বন্দুক হাতে একটা বেঁটে আর একটা লম্বা ছায়ামূর্তি তাদের ফেলে আসা হারিকেনের আলোয় গর্তটা দেখছে। টর্চ ফেলে চারদিকটাও একটু দেখে নিল তারা।

“ওরা কারা মশাই?”

“তার আমি কী জানি?”

করুণ গলায় গুরুপদ বলল, “গুপ্তধন কি শেষে ওদের হাতেই যাবে মশাই?”

“রকম-সকম দেখে তাই তো মনে হচ্ছে।”

“বাইবেল আর নকশাখানাও যে ওখানে পড়ে রইল?”

বটু বলল, “তা কী আর করা যাবে বলো? বিপদে অর্ধেক ত্যাগ করতে হয়।”

হতাশ গলায় গুরুপদ বলল, “কিন্তু ধর্মত, ন্যায্যত গুপ্তধনটা তো আমাদেরই প্রাপ্য, কী বলেন? আমরাই তো আবিষ্কার করেছি, খোড়াখুঁড়ি করেছি।”

“সে তো বটেই। কিন্তু সেকথা ওদের বুঝিয়ে বলা শক্ত হবে।”

“এটা কিন্তু আমাদের উপর খুব জুলুম হচ্ছে! ইস, কত জিনিস তুলে ফেলেছিলাম। আর একটু খুঁড়লেই মোহরের ঘড়াও পাওয়া যেত!”

“হু।”

“না মশাই, আপনার যেন তেমন হেলদোল নেই? সত্যি করে বলুন তো, আপনার আফসোস হচ্ছে না?”

“হচ্ছে না আবার? খুব হচ্ছে! হওয়ারই কথা কিনা!”

হঠাৎ শোনা গেল, দু’জন লোকের একজন একটু চেঁচিয়ে বলে উঠল, “ওরে পানু, এই যে সেই বাইবেল আর গুপ্তধনের নকশা !”

“কই, দেখি দেখি!”

“এটা নিশ্চয়ই ওই বটু শয়তানের কাজ। ও-ই এসেছিল গুপ্তধন উদ্ধার করতে। খুব সময়মতো এসে পড়েছিলাম রে! চারদিকে নজর রাখতে হবে, বুঝলি! বটু বহুত চালাকি জানে। এবার ওকে খতম করতে পারলে তবে শান্তি।”

গুরুপদ শুকনো গলায় বলল, “ওরা যে আপনার কথা বলছে!”

“তই তো দেখছি! চলো বাপু, আর এখানে দাড়িয়ে থাকার দরকার নেই। শীতটাও চেপে পড়েছে। খোড়াখুড়ির মেহনতও হয়েছে কম নয়।”

“চলুন।”

খানিকক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর হঠাৎ গুরুপদ বলে উঠল, “আমার কী মনে হয় জানেন?”

“কী মনে হয়?”

“এরকম যে হবে আপনি তা জানতেন।”

“আরে না না। আমাকে কি সবজান্তা ঠাওরালে বাপু?”

“গুপ্তধনটা হাতছাড়া হল, নকশাটা পর্যন্ত বেহাত হল, কিন্তু আপনার যেন তেমন দুঃখ-টুঃখ হচ্ছে না!”

“দুঃখ হচ্ছে বই কী! বেশ দুঃখ হচ্ছে।”

“আমার এমনও মনে হচ্ছে যে, আপনি ওই লোক দুটোকে চেনেন!”

“শোনো কথা! মানুষ চেনা কি আর সোজা কথা নাকি? এত সহজে মানুষ চেনা গেলে তো ভাবনাই ছিল না।”

“আপনি খুব বিটকেল লোক!”

“তা তো বটেই! আমি কি কখনও বলেছি যে, আমি লোক ভাল?”

গুরুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে হাটতে লাগল।

বাড়িতে এসে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ভাবল গুরুপদ। গুপ্তধনটা হাতের মুঠোয় এসেও এল না! খুনে দু’জন আর-একঘণ্টা পরে এলেও কাজ হয়ে যেত!

শেষ রাতে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল গুরুপদ। সকালে উঠে দেখল, বটু সর্দার তার ঘরে বেশ হাসিখুশি মুখে বসে আছে। হাতে সেই বাইবেলখানা আর নকশাটাও। গুরুপদ অবাক হয়ে বলল, “ওগুলো কোথায় পেলেন?”

বটু হেসে কুটিপাটি হয়ে বলল, “সে আর কোয়ো না বাপু! সকালের দিকে চুপিচুপি কাণ্ডখানা দেখতে গিয়ে দেখি, লোক দুটো বেদম হয়ে হেঁদিয়ে পড়ে আছে। সারারাত খোড়াখুড়ি করেছে তো! জিনিসও তুলেছে সেথা। একপাজা চিনেমাটির বাসন, দুটো বড়বড় লোহার গামলা, গোটাদুই কেঠো চেয়ার, একটা মরচে পড়া গাদাবন্দুক, আতশ কাচ, চাবির গোছা, পোড়ামাটির পুতুল, আরও কী সব যেন। তা অত খাটুনিতে দু’জনেই নেতিয়ে পড়েছিল। আমি গিয়ে বাইবেল আর নকশাখানা তুলে নিয়ে এলাম।”

গুরুপদ নাক সিটকে বলল, “ওগুলো কেমনধারা গুপ্তধন মশাই? কেবল গুচ্ছের থালা-বাটি-গামলা আর ভাঙা বন্দুক! ঘড়াঘড়া মোহর বেরোবে তবে না! তা ঘড়া-টড়া দেখলেন না কিছু?”

“আহা, ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ঘড়াও কি আর না বেরোবে? আরও খোড়াখুড়ি করতে দাও না, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে’খন।”

গুরুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “বেরোলেই বা আমাদের কোন লবডঙ্কা হবে বলুন ! সবই তো ওদের দখলে যাবে।”

বটু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, “তা অবিশ্যি ঠিক।”

“না মশাই, আপনার ভাবগতিক আমি ভাল বুঝছি না। ওরা সব সোনাদানা তুলে ফেলছে আর আপনি দিব্যি গায়ে ফু দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।”

“ওরে বাপু, ভাল দিকটাও তো দেখতে হবে।”

“এর আবার ভাল দিকটা কী মশাই?”

“একটু তলিয়ে ভাবলেই বুঝতে পারবে। খোড়াখুঁড়ির মেহনতটা তো আর তোমাকে পোয়াতে হচ্ছে না। ওদের উপর দিয়েই যাচ্ছে। সেটা ভাল হচ্ছে না?”

“না, হচ্ছে না। একটা কথা আছে না, পেটে খেলে পিঠে সয়। মেহনতে যদি সাতঘড়া সোনা পাওয়া যায় তা হলে সেটা খারাপ হবে কেন?”

বটু হঠাৎ যেন খুব চিন্তিত হয়ে ভ্রূ কুচকে বলল, “তাই তো! এটাও তো ভাববার মতো কথা!”

“তাই তো বলছি। একটু ভাবুন। দরকার হলে আরও দশজন লোক জুটিয়ে আমরা ওদের উপর গিয়ে হামলা করতে পারি।”

বটু আঁতকে উঠে বলল, “ওরে সর্বনাশ! খবরদার ও কাজ করতে যেয়ো না। ওরা দু’জনেই খুনেগুন্ডা। দশ-বিশটা লাশ লহমায় ফেলে দেবে।”

ভয় খেয়ে গুরুপদ বলল, “তা হলে কী করব?”

“চুপটি করে থেকেই দ্যাখো না। ওদিককার গর্তটা আরও একটু বড় হতে থাক। তারপর দেখা যাবে।”

তা ঘড়াও শেষ অবধি পাওয়া গেল। একটি-দু’টি নয়, পরপর সাত-আটটা ঘড়া এবং পাওয়া গেল প্রাণান্তকর পরিশ্রমের পর, দ্বিতীয় রাত্রির শেষে, ভোরবেলার দিকে। তবে তখন পানু আর নিতাইয়ের দম শেষ, টর্চের আলো নিবু-নিবু, শরীর ভেঙে আসছে। দু রাত্রি আর-একটা পুরো দিন ধরে মাটি খুঁড়ে ঝুড়ি-ঝুড়ি মাটি উপরে এনে ফেলতে হয়েছে। ঘুমোতে পারেনি ভয়ে, ভাল করে খাওয়া হয়নি। গুপ্তধনের নেশায় তারা পাগলের মতো গর্ত খুঁড়েছে। শেষ অবধি জনসাহেবের শোওয়ার ঘরের নীচে পাওয়া গেল একটা ছোট চোরকুঠুরি। নিবু-নিবু টর্চের আলোয় অবশেষে চোখে পড়েছে মাটির উপরে সাত-সাতটা ঘড়ার মুখ জেগে আছে।

ঘড়া তুলতে গিয়ে তারা টের পেল, শরীরে আর একরত্তিও শক্তি অবশিষ্ট নেই। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। চোখে অন্ধকার দেখছে। মাথা ঝিমঝিম করছে।

টলতে-টলতে কোনও রকমে ছেচড়ে-হিঁচড়ে দু'জনে উপরে উঠে এল। তারপর মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। বাইরে আলো ফুটেছে, পাখি ডাকছে, সূর্য উঠি-উঠি করতে লেগেছে।

কতক্ষণ তারা ঘুমিয়েছে তার হিসেব ছিল না। হঠাৎ একটা হইহই চেঁচামেচি আর বহু লোকের পায়ের শব্দে চমকে দু'জনের ঘুম ভাঙল। দেখল, বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে, চারদিকে ঝলমলে রোদ্দুর। আর সভয়ে দেখতে পেল, পালে-পালে লোক কোদাল, শাবল, গাইতি, বস্তা নিয়ে তেড়ে আসছে এদিকেই। অনেকের হাতেই একটা করে কাগজ।

নিতাই চট করে উঠে বসে পিস্তল বের করে গর্জন ছাড়ল, "খবরদার।" তবে গলা ফেঁসে যাওয়ার পর গর্জনটা ফুটল না, একটা ফ্যাসফেসে আওয়াজ বেরোল

কেবল।

পিস্তল দেখে লোকগুলো ভয় খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পানু দুম করে তার পিস্তল থেকে একটা গুলি চালিয়ে দিয়ে বলল, "যে কাছে আসবে সে-ই মরবে।"

একজন মাতব্বর লোক দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল, "তোমরা কারা হে? বাইরের লোক গাঁয়ের এলাকায় ঢুকেছ যে বড়? ডাকাত নাকি?"

নিতাই বলল,"কে বলল ডাকাত? আমরা সরকারি লোক, সার্ভে করতে এসেছি।"

"সার্ভেয়ারের তো বন্দুক থাকার কথা নয়!"

নিতাই বলল, "আমাদের সিকিউরিটির জন্য বন্দুক রাখতে হয়। সরকারের কাজে বাধা দিয়ে না, সরে পড়ো।"

সামনের লোকগুলো নিজেদের মধ্যে একটু কথা বলাবলি করে নিচ্ছিল, তাদের পিছন থেকে হঠাৎ কয়েকজন ছেলেছোকরা চেঁচিয়ে বলে উঠল, "এরা আমাদের গুপ্তধন চুরি করে নিতে এসেছে। ওই দ্যাখো কত জিনিস মাটি খুঁড়ে তুলে এনেছে!"

তারপরই মার-মার করে ক্ষিপ্ত জনতা তেড়ে এল। দমাদম লাঠিসোটা পড়তে লাগল তাদের গায়ে, মাথায়, হাতে।

নিজেদের বাঁচানোর জন্য হাতখানাও তোলার সাধ্য ছিল না নিতাই আর পানুর। ঝিমিয়েই ছিল, মার শুরু হতেই অজ্ঞান হয়ে গেল। তাদের তুলে আনা জিনিসপত্র লুঠপাট হয়ে যেতে তিলার্ধ বিলম্ব হল না।

বহু লোক গর্তে নেমে আরও খোড়াখুড়ি করে কেউ একখানা কাটাচামচ, কেউ কলমদানি, কেউ একখানা মরচে-পড়া ছুরি এইসব পেয়ে যেতে লাগল। শেষমেশ ঘড়াও বেরিয়ে পড়ল বটে। তবে দেখা গেল সেগুলো মোটেই মোহরের ঘড়া নয়, জল রাখবার বেলেমাটির ঘড়া। আগেকার দিনে জল ঠান্ডা করার জন্য মাটির নীচে পাতালঘরে এসব ঘড়ায় রাখা হত।

ঘটনাস্থল থেকে একটু দূরে ফলসাবনের ঝুপসিতে একখানা পাকুড়গাছের ছায়ায় লম্বা, টান, কালো আর মজবুত চেহারার একজন লোক আড়াল থেকে গোটা দৃশ্যটা খুব ঠান্ডা চোখে দেখে নিচ্ছিল। তার মাথায় বাবরি চুল, মস্ত পাকানো গোফ, হাতে একটা পাকা বাঁশের লম্বা লাঠি। তার পিছনে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আরও জনাচারেক গম্ভীর ও মজবুত চেহারার লোক চুপচাপ খাপ পেতে বসে আছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। তবে তাদের চোখ জ্বলজ্বল করছে।

ওগুলো পাওয়া না গেলেও গাঁয়ের লোক বেশ খুশিই। অনেকদিন পর গা গরম করা একটা কিছু তো হল। তা ছাড়া কেউ শুধু হাতেও ফিরছে না। ছোটখাটো জিনিস সবাই এক-আধটা পেয়েছে। তাই বা মন্দ কী? দুপুর গড়ানোর আগেই ধীরে-ধীরে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল। মস্ত শিশুগাছের তলায় শুধু নিতাই আর পানু অজ্ঞান হয়ে চিতপটাং পড়ে আছে।

ধীরে ধীরে লম্বা লোকটা এসে খোঁড়াখুঁড়ির জায়গাটা দাঁড়িয়ে চারদিকটা ভাল করে লক্ষ করল। তার পিছনে গম্ভীর চারটে লাঠিধারী ষন্ডা চেহারার মানুষ।

লম্বা লোকটা একটা কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে ভ্রু কুঁচকে একটু দেখল। তারপর স্যাঙাতদের একজনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "এই সেই গুপ্তধনের নকশা।"

স্যাঙাতটা বলল, "হু। এটাই জেরক্স করে বিলি করা হয়েছে তো?"

"হ্যা।"

"কিন্তু কেন বেজাবাবু? মতলবটা কী?"

"বুঝলি না? যে বিলি করেছে সে ভালই জানত, এখানে গুপ্তধন নেই। কিন্তু নিতাই আর পানু লোভী। ওদের কোনওভাবে নকশাটা গছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর ব্যবস্থা করার জন্য নকশাটার জেরক্স বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়!"

"কিন্তু করলটা কে?"

"যে করেছে তার টিকির নাগাল পেতে গত পাঁচবছর ধরে আমি কম হয়রান হইনি। দু'বার বাগে পেয়েও ছিলাম, কিন্তু পিছলে বেরিয়ে গিয়েছে।"

"এ কি বটু সর্দারের কাজ বেজাবাবু?"

"বটু সর্দার ছাড়া এমন ট্যাটন আর কে?"

স্যাঙাতদের আর-একজন বলে উঠল, "কিন্তু তাকে তো আপনি ভিটেছাড়া করে দিয়েছেন। তার চেলাচামুণ্ডারাও সব ছিটকে ছড়িয়ে গিয়েছে। তার দলবলও নেই, পয়সাও নেই। বয়সও হয়েছে।"

বেজাবাবু গম্ভীর হয়ে ভ্রকুটি করে বলল,"আর কিছু না থাক, মাথাভরা শয়তানি বুদ্ধি এখনও আছে। আর সেটা যতদিন আছে ততদিন তাকে জব্দ করা সহজ কাজ নয়।"

কেউ কোনও কথা বলল না।

বেজাবাবু তার স্যাঙাতদের একজনের দিকে চেয়ে বলল, "শ্যামলাল, গোপালহাটিতে তোর চেনাজানা কে একজন আছে বলছিলি না?"

"হ্যাঁ। রায়বাড়ির সুজয়পদ রায়। পালোয়ান মানুষ। একসময় নয়াগঞ্জে শচীন তাতির আখড়ায় দু'জনেই ডন-বৈঠক করতাম।"

"একটু খোঁজ নিয়ে দ্যাখ তো, বটু গোপালহাটিতেই গা ঢাকা দিয়ে আছে কি না। যত দূর মনে হচ্ছে, আসল নকশাখানা হাতে রেখে বটু একটা জালি নকশা নিতাই আর পানুকে গছিয়েছিল।"

স্যাঙাতদের আর-একজন, নিতান্তই সদ্য গোফ গজানো ছোকরা বলল,"কিন্তু বেজাবাবু, ধরুন ফস করে যদি বটু সর্দারের সঙ্গে আমাদের কারও মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়, তা হলে কী করতে হবে?"

বেজাবাবু ভ্রুকুটি-কঠিন দৃষ্টিতে ছোকরার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বলল, "সেটাও বলে দিতে হবে? দেখামাত্র এক লহমাও দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালিয়ে দিবি। মুখে আর মাথায়। মনে থাকে যেন, এক লহমাও দেরি করা

চলবে না। যদি দু’ সেকেন্ডও দেরি হয়, তা হলেই বটু ছায়া হয়ে যাবে, মায়ার মতো মিলিয়ে যাবে। বটুর পিছনে বহু বছর লেগে থেকেও আজ অবধি আমি বুঝে উঠতে পারিনি, বটু মানুষ না ভূত! কায়া না ছায়া! বুঝেছিস?”

কেদার নামের ছোকরাটি বলল, “বুঝলাম। কিন্তু ভয় হল, বটু সর্দারকে কখনও চর্মচক্ষে দেখিনি। বটু মনে করে ভুল লোককে মেরে না দিই।”

“তাতে ক্ষতি নেই। যুদ্ধের সময় কত নিরীহ মানুষও তো মরে। সেটা তো ধর্তব্যের মধ্যে নয়। বটু বলে যাকেই মনে হবে তাকেই গুলি করবি। মনে থাকে যেন, যে বটুকে মারতে পারবে তার জন্য পাঁচ হাজার টাকার ইনাম আমার কবুল করাই আছে।”

ছোকরা কেদার গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল, বুঝেছে। পরক্ষণেই সে তলচক্ষুতে তার পাশে আর-এক ছোকরা ফটিকের দিকে চেয়ে একটা অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। ফটিক বা চোখটা একটু ছোট করে মৃদুস্বরে বলল, “চেপে যা।”

চোখে-মুখে ঠান্ডা জলের ঝাপটা খেয়ে নিতাই আর পানু যখন চোখ মেলল, তখন শীতের বেলা অনেকটাই চলে গিয়েছে। ঝাপসা চোখে তারা সামনে কালান্তক যমের মতো বেজা মল্লিককে দেখে আঁতকে উঠে কাঠ হয়ে গেল। কোনওরকমে কেতরে ককিয়ে উঠে বসে নিতাই হ্যাদানো গলায় বলল,“আমাদের মারবেন না বেজাবাবু, আমাদের দোষ নেই।”

“আপনাকে না জানিয়ে আপনার এলাকায় কোনও কাজে কখনও হাত দিয়েছি, বলুন?”

বেজাবাবু গম্ভীর হয়ে বলল, “এই জালি নকশা তোরা কোথায় পেলি?”

পানু বলল, “নকশা জালি নয় বেজাবাবু। সেই পুরনো বাইবেল আর আসল নকশা নিয়ে পরশু রাতে স্বয়ং বটু সর্দার এখানে মাটি খুঁড়ছিল।

“বটু সর্দার। ঠিক জানিস বটু সর্দার?”

“দূর থেকে হ্যারিকেনের আলোয় দেখা। রাতে কুয়াশাও ছিল। হলফ করে বলতে পারব না। তবে দু’জন লোক এসেছিল। বুড়োজনকে দূর থেকে বটু সর্দার বলে মনে হয়েছে আমাদের দু’জনেরই।”

“তারপর?”

“সুযোগ হাতে এসে যাওয়ায় আমরা তাড়া করে যাই। গুলিও চালিয়েছিলাম। ওরা বাইবেলখানা আর নকশাটা ফেলেই প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যায়। আমরা দুটো জিনিসই ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি। সেটা পুরনো সেই বাইবেলই বটে, আর নকশাখানাও আসল।”

“সে দুটো এখন কোথায়?”

“সে দুটো এখানেই থাকার কথা। কিন্তু গাঁয়ের লোকের হুজুতে কী হয়েছে বলতে পারব না।”

বেজাবাবু আষাঢ়ে মেঘের মতো মুখ করে বলল, “দ্যাখ নিতাই, গত দশ বছর ধরে এই মহল্লার গাঁয়ে-গাঁয়ে সেই পুরনো বাইবেল আর তার ভিতরে রাখা

নকশাখানার খোঁজ হচ্ছে। কারও কাছে সন্ধান পাওয়া যায়নি। তোরা কি বলতে চাস, পরশু রাতে হঠাৎ করে তোদের হাতের নাগালে বাইবেল আর নকশা স্বয়ং মা কালীই এগিয়ে দিল! না কি আর-একটা গল্প ফেঁদে আমাদের হয়রান করতে চাইছিস?”

নিতাই হাঁফসানো গলায় বলল, “না বেজাবাবু, মাকালীর দিব্যি করেই বলছি, বাইবেল আর নকশা বাস্তবিকই আমাদের হাতে এসে গিয়েছিল। কপালের ফের ছাড়া আর কী বলি বলুন? গাঁয়ের লোকগুলো হুড়ো না দিলে...!”

খোড়াখুড়ি করেও গুপ্তধনের কিছুই পায়নি। আর তারও আগে ওই নকশা জেরক্স কপি করে বাজারে কাল সকালে বিলি করা হয়েছিল। নকশাটা যদি আসলই হবে, তা হলে সেটা কি কোনও আহাম্মক বিলি করে বেড়ায়?”

নিতাইয়ের মুখ শুকিয়ে গেল। সে স্থলিত কণ্ঠে বলল, “অ্যাঁ! এ খবর তো আমাদের জানা ছিল না বেজাবাবু!”

নিতাইয়ের মুখ শুকিয়ে গেল। সে স্খলিত কণ্ঠে বলল,“অ্যাঁ! এ লিফলেটের মতো কী যেন ছিল বটে!”

বেজাবাবু বলল, “নিতাই, তুই একসময় বটু সর্দারের চেলা ছিলি, একটা কথার সাফ জবাব দে। তুই কি এখনও বটু সর্দারের হয়ে কাজ করছিস? তোকে সামনে রেখে আড়াল থেকে বটু আমাকে ঘোল খাওয়াবার চেষ্টা করছে না তো?”

“না বেজাবাবু, মা কালীর দিব্যি।”

“তা হলে যা, এবারের মতো ছেড়ে দিচ্ছি। এ তল্লাটে ফের ঢুকবি তো লাশ হয়ে বেরোবি।”

ছয়

বাঘা শীত আর হাকুচ অন্ধকারে একজন লোক গোপালহাটির রায়বাড়ির পশ্চিম দিককার একটা ঘরের জানলার গ্রিল খুব মন দিয়ে আধঘণ্টার চেষ্টায় নিঃশব্দে খুলে সরিয়ে ফেলতে পারল। তার হাতযশ কিছু কম নেই। মহল্লায় তার বেশ সুখ্যাতি আছে। একটু দম নিয়ে মা কালী আর বাবা বিশ্বকর্মাকে একটা করে নমো ঠুকে সে 'দুর্গা' বলে জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু ঢুকেই তার একগাল মাছি। সামনেই চৌকিতে উবু হয়ে বসা একটা লোক তাকে জুলজুল করে দেখছে। তার ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা।

উবু হয়ে বসা লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল, "ছ্যাঃ ছ্যাঃ, এই তোর কাজের ছিরি! একটা গ্রিল সরাতে আধঘণ্টা, রেওয়াজ করিস না নাকি? অমন হাঁচোড়-পাঁচোড় করে কি গেরস্তর ঘরে ঢুকতে হয় রে আহাম্মক? যেন পদ্মবনে হাতির প্রবেশ! তার উপর হাপরের মতো হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাঁফাচ্ছিস! এটুকু মেহনতেই দমসম হয়ে গেলি বাবা? এসব দেখেই তো মাঝে-মাঝে আমার কাশী চলে যেতে ইচ্ছে হয়।"

লোকটা কাচুমাচু হয়ে বলল, "কোথায় ভুলটা হল বলুন তো?"

"আগাগোড়াই ভুল! তোর মাথা থেকে পা পর্যন্তই তো ভুল! গায়ে ঝুড়ি-ঝুড়ি মাংস, চালচলতি গদাই লস্করের মতো, হাত-পায়ে চটপটে ভাবটাই নেই। ঘরে যে একটা জাগা-মানুষ বসে আছে, সেটা অবধি আগাম টের পেলি না। তার উপর এত কসরত করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ঢুকলি কিনা একটা ভুল ঘরে?"

চোরটা যেন একটু আঁতকে উঠে বলল, "ভুল ঘরেই ঢুকলাম নাকি?"

"তা ঢুকিসনি! এ ঘরে যে চোরের অম্বুবাচী! তা কার কাছে তালিম নিয়েছিলি?"

চোরটা ভারী জড়সড় হয়ে বলল,"আজ্ঞে, নমস্য নবকান্ত গুছাইতের কাছে।"

লোকটা ভ্রু কুঁচকে বলল, "পলাশডাঙার নব নাকি?"

"আজ্ঞে, তিনিই।"

"তা নব তো হ্যাতানাকা লোক নয়, পেটে বিদ্যে আছে। তোদের দোষ কী জানিস? ভাল করে কাজ না শিখেই রোজগার করতে নেমে পড়িস! ওতেই তো ওস্তাদের বদনাম হয়।"

চোর মাথা চুলকে বলল, "শেখার তো ইচ্ছেও ছিল মশাই, কিন্তু পাপী পেটের যে তর সয় না। পেটের জ্বালাতেই নেমে পড়তে হয়েছে।"

"তাতে লাভ কী হল বল? মেহনতটাই তো জলে গেল?"

চোরটা এবার একগাল হেসে মাথা নেড়ে বলল, "না, জলে যাবে কেন? ঠিক জায়গায়, ঠিক মানুষটির কাছেই তো এসেছি।"

চোর হাত কচলে বলল, "ছেলেবেলা থেকে লোকের মুখে মুখে যার নাম শুনে আসছি, যাকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্য দশ মাইল দৌড় করতেও

রাজি আছি, যার নাম শুনলে এখনও সাতটা মহল্লার লোক মাথা নিচু করে, সেই বটু সর্দারের কাছেই তো এসেছি, আজ্ঞে। একটু কেরদানি দেখিয়ে আপনাকে ভেজাব বলে সোজা পথে না এসে একটু বাকা পথে আসতে হয়েছে।"

বটু সর্দার একটা বড় শ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বলল, "বৃথাই হয়রান হলি বাবা! সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই। তিন কুড়ি বয়স হল, বেজা মল্লিকের হুড়ো ভেযে ভদ্রওসন ছেড়ে আলায়-বালায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, দলবল ভেঙে গিয়েছে। না রে, বটু সর্দার আর বেঁচে নেই।"

চোরটা টক করে বটুর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল, "আজ্ঞে, মরা হাতি লাখ টাকা।"

বটু গায়ের কম্বলটা আরও একটু জড়িয়ে বসে বলল, "তা তুই কে রে?"

"আজ্ঞে, আমার নাম কেদার। বাইরে আমার আরও এক বন্ধু আপনার শ্রীচরণ দর্শনের জন্য অপেক্ষা করে আছে। ফটিক। যদি অনুমতি দেন তো তাকেও ডাকি।"

"আর ধ্যাষ্টামো করতে হবে না। তুই কোন অনুমতি নিয়ে ঢুকেছিলি? ডেকে আন, এই ঠান্ডায় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।"

কিছুক্ষণ পরে আরও-এক ছায়ামূর্তি ঘরে ঢুকে একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল বটুকে।

বটু অবাক হয়ে বলল, "বেজ মল্লিক! সে তোদের পাঠিয়েছে নাকি? তা হলে আর দেরি কেন বাবারা, বন্দুক, পিস্তল, ছোরাচুরি যা আছে বের করে ফ্যাল। আধমরা তো হয়েই আছি, বাকিটুকু তাড়াতাড়ি সেরে চলে যা। গয়েশপুরের গোরাং গনতকার বলেও ছিল বটে যে, তিন কুড়ি বয়সে আমার একটা জব্বর ফাঁড়া আছে।"

দু'জনেই পটাং করে তার পায়ের উপর পড়ে গেল। কেদার বলল, "না মশাই, না। আপনাকে মারলে যে আমাদের হাতে কুষ্ঠ হবে। বেজা মল্লিক আপনাকে খুন করতে পাঁচ হাজার টাকা কবুল করেছে বটে, কিন্তু আমরা ওর মধ্যে নেই।"

"তবে তোরা চাস কী?"

কেদার গদগদ হয়ে বলল, "বিদ্যার জাহাজ আপনি। আমাদের একটু শিক্ষে-টিক্ষে দেন। রেচক, পূরক, কুম্ভক, বায়ুবন্ধন, সর্পভয়, সারমেয় ভয় নিবারণ, যোগিনীবিদ্যা, ঘুমপাড়ানি মন্তর, সর্পগতি, ব্যাঘ্রগতি, বানরগতি, হস্তলাঘব, পদলাঘব, কত কী জানা আছে আপনার! ওর ছিটেফোটাও যদি শিক্ষে করতে পারি, তা হলে কি আর বেজা মল্লিকের মতো পাষণ্ডের শাগরেদি করি? খুন, জখম, লুটপাট ছাড়া সে আর কিছু জানেই না। সত্যি বলতে কী, খুন-জখম, মারদাঙ্গা আমাদের মোটে সহ্য হয় না। ওসব কাজে আর্ট নেই। মোটা দাগের কাজ।"

বটু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ওরে, আমার যে তিন কুড়ি…!"

"পায়ে ঠেলবেন না মশাই, অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আসতে হয়েছে। বেজা মল্লিকের শাগরেদ শ্যামলাল আপনার খবর বেজা মল্লিককে পৌঁছে দিয়েছে। বেজা মল্লিক আমাদেরই পাঠিয়েছে আপনাকে নিকেশ করতে। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছি আপনাকে একবার চোখের দেখা দেখতে পাব বলে।"

বটু অনিচ্ছের সঙ্গে বলল, "তোরা বড় মুশকিলে ফেললি দেখছি!"

লোকে বলে, শশীমুখী নাকি বিড়ালের পায়ের শব্দও শুনতে পান। তা কথাটা খুব একটা মিথ্যেও নয়। শশীমুখীর কান বড় সজাগ। কান সজাগ, চোখ সজাক, নাক সজাগ।

মাঝরাতে কাছেপিঠে একাধিক লোকের নিচু গলায় কথা হচ্ছে শুনতে পেয়ে স্বামী অজয়পদকে ঠেলা দিলেন শশীমুখী। কিন্তু অজয়বাবুর ঘুম ভাঙল না। শীতকাতুরে রোগাভোগা লোক, হাঙ্গামা হুজুতে ভয় পান। কিন্তু শশীমুখীর ভয়ডর বলে কিছু নেই। দরজার বাটামটা খুলে সেটাই বাগিয়ে ধরে ভিতরের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। তারপর সন্দেহজনক ঘরটার দরজায় কান পেতে সব কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন।

কিন্তু যা শুনলেন, তাতে সাহসিনী শশীমুখীরও বুক ধড়ফড় করতে লাগল, মাথা ঝিমঝিম করে সরষেফুল দেখতে লাগলেন। প্রায় মূর্ছাই যান আর কী! কোনওরকমে গিয়ে অজয়পদকে ঠেলে তুলে বললেন, "ওগো, গুরুপদ পোড়ারমুখো ও কোন সব্বোনেশে লোককে বাড়িতে এনে তুলেছে? এ যে চোরেদের সর্দার, ডাকাতদের চাই, খুনে বদমাশ গুন্ডাদের গুরুঠাকুর! এ যে খাল কেটে কুমির এনেছে গো!"

"অ্যাঁ! কী সর্বনাশ !"

"নিশুতরাতে ঘরে চোর-ঠ্যাঙাড়েদের পাঠশালা বসিয়েছে। প্রথমদিন দেখেই বুঝেছিলুম ও একটা মিটমিটে ডান। ওই আহাম্মক গুরুপদকে ভুজুংভাজুং দিয়ে এ বাড়িতে সুচ হয়ে ঢুকেছে, এবার ফাল হয়ে বেরোবে। বিশ্বাস না হয় আমার সঙ্গে এসো, নিজের কানে শুনে যাও...!"

অজয়পদ সভয়ে শশীমুখীর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, "পাগল নাকি? ওসব শোনা খুব খারাপ।"

শশীমুখী ধমক দিয়ে বললেন, "তা বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে নাকি? গিয়ে একটু হাঁকডাক করো।"

অজয়পদ কুঁকড়ে গিয়ে বললেন, "সেটা কি ভাল দেখাবে? অন্যের কথাবার্তার মধ্যে নাকগলানো কি ভাল? ওঁরা হয়তো ভারী অসন্তুষ্ট হবেন। ভাববেন, অজয়বাবুর এ কীরকম ব্যবহার!"

"ভাবলে ভাবুক। তোমাকে এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, ওঠো তো, ওঠো!"

সকালটা হতে দাও, তারপর লোকজন জড়ো করে না হয়...!"

"বলো কী? ততক্ষণে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে! এক্ষুনি লোকটাকে বাড়ি থেকে বেঁটিয়ে বিদেয় না করলেই নয়!"

"সেটা কি ঠিক হবে? শত হলেও অতিথি নারায়ণ!"

"নারায়ণ না বিভীষণ! এরকম অতিথিকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করতে হয়।"

"তোমার তো ওই দোষ। চট করে উত্তেজিত হয়ে পড়ো। এমনও তো হতে পারে যে, বটুবাবু একটা চোরকে ধরে ফেলেছেন। ধরে এখন তাকে ঘরে বসিয়ে নানারকম সদুপদেশ দিচ্ছেন। তাতে চোরটার হয়তো ভারী অনুশোচনা হচ্ছে। সে হয়তো এখন চোখের জল ফেলতে ফেলতে কৃতকর্মের জন্য জ্বলেপুড়ে মরছে। তাতে ঠিক এই সময় দরজার বাইরে থেকে কে যেন ভারী বিনয়ের গলায় বলে উঠল, "বড়কর্তা কি জেগে আছেন নাকি?"

অজয়পদ অাঁক করে খানিকটা বাতাস গিলে ফেললেন। গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। শরীরে স্তম্ভন। শশীমুখী তেড়ে উঠে বললেন, "কে রে?"

"আজ্ঞে মাঠান, আমি বটু সর্দার। বলছি কী, একগাছ দড়ি হবে মাঠান?"

"দড়ি ! এত রাতে দড়ি দিয়ে কী হবে?"

"আর ক'বেন না মাঠান! দুটো অপোগণ্ড এসে জুটেছে। আনাড়ির হদ্দ। তাদের একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিচ্ছি আর কী। বন্ধনমোচন বিদ্যের কথা কি শুনেছেন মাঠান?"

"না বাপু, শুনিনি।"

"ভারী কাজের জিনিস মাঠান। পিছমোড়া করে বা হেঁটমুন্ডু করে বেঁধে রাখলে কোন কায়দায় তা খুলে ফেলা যায় সেইটাই শেখাচ্ছি আর কী।"

"না বাপু, এ ঘরে দড়িদড়া নেই।"

"আছে বই কী মাঠান, খুব আছে। আপনার খাটের পায়ের দিকে ডান দিকের কোণে আলনার পিছনে দেওয়ালের পেরেকে ঝোলানো একটা চটের থলির মধ্যে হাত ঢোকালেই একগাছা মজবুত পাটের দড়ি পেয়ে যাবেন, আজ্ঞে।"

শশীমুখী চোখ কপালে তুলে বললেন, "কী সব্বোনেশে লোক দেখেছ!"

অজয়পদ ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, "দিয়ে দাও, যা চায় সব দিয়ে দাও, শুধু দড়ির উপর দিয়ে গেলে তবু রক্ষে!"

শশীমুখী কম্পিতবক্ষে উঠে দড়িগাছা জানলা গলিয়ে বারান্দায় ফেলে দিয়ে এসে অজয়পদর পাশে বসে বললেন, "ভয়ে আমার মাথা ঝিমঝিম করছে, আমি বোধ হয় মূর্ছাই যাব।"

অজয়পদ খিঁচিয়ে উঠে বললেন, "মূর্ছা যাবে মানে? গেলেই হল? আমার অনেকক্ষণ আগেই মূর্ছা পেয়েছে, এতক্ষণ চেপেচুপে ছিলুম। আগে আমারটা হয়ে যাক, তারপর তুমি!" বলেই অজয়পদ বিছানায় চিতপাত হয়ে মূর্ছা গেলেন।

কাকভোরে শশীমুখীর চেঁচামেচিতে বাড়ির লোকের ঘুম ভাঙল। পাড়া-প্রতিবেশীরাও ছুটে এল দুদ্দাড় করে।

শশীমুখী উঁচু গলায় বলছিলেন, “ও গুরুপদ, এ কোন সব্বোনেশে লোককে বাড়িতে এনে তুলেছিস? এ যে চোরের সর্দার, ডাকাতের চাই, খুনে-গুন্ডাদের গুরুঠাকুর! খাল কেটে কুমির এনেছিস পোড়ারমুখো? সব যে ছারখার হয়ে যাবে রে!”

সদ্য ঘুম থেকে উঠে আসায় সবাইখানিকটা তটস্থ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, হতবুদ্ধি।

পাড়া-প্রতিবেশীদের দিকে চেয়ে শশীমুখী করুণ গলায় বললেন, “ওগো, তোমরা সব দাঁড়িয়ে দেখছ কী? শিগগির এই বজ্জাতকে বিদেয় করার ব্যবস্থা করো! নিশুতরাতে ঘরে চোর-ঠাঙাড়েদের পাঠশালা বসিয়েছে গো! যত রাজ্যের চোর-ডাকাত নিশুতরাতে এসে জড়ো হচ্ছে!”

ব্যাপারটা বুঝে উঠতে লোকের একটু সময় লাগল বটে, কিন্তু তারপরই চারদিকে একটা চেঁচামেচি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। গায়ের মাতব্বররাও সব এসে জুটলেন। সব শুনে তারাও অতিকে উঠলেন, “সর্বনাশ! গোপালহাটিতে কি শেষে চোর-ডাকাতের আঁতুড়ঘর তৈরি হবে! কোথায় সেই বদমাশ? ধরে আন তাকে!”

দশ-বারোজন ছেলে-ছোকরা মুহূর্তের মধ্যে গিয়ে বটু সর্দারের ঘর থেকে তাকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিয়ে এল।

“কী হে বটু, এসব কী শুনছি?” বটু জুলজুল করে মাতব্বরদের মুখের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বলল, “আজ্ঞে মাঠান, সত্যি কথাই বলছেন।”

“তোমার ঘরে রাতবিরেতে চোর-ডাকাতরা আসে?”

“যে আজ্ঞে।”

“তুমি তাদের চুরি-ডাকাতি শেখাও?”

“আর কী শেখাব, অন্য বিদ্যে তো জানি না।”

“সর্বনাশ! দেশ যে রসাতলে যাবে! ওরে, তোরা থানায় খবর দে।”

লোক থানায় খবর দিতে গেল বটে। কিন্তু তার আগেই বটুর উপর বিস্তর চড়চাপাটি, ঘুসি আর লাথি শুরু হয়ে গেল। কে যেন একবার চেঁচিয়ে বলার চেষ্টা করল, “ওরে, বুড়োমানুষ! মরে না যায়, দেখিস!”

কিন্তু কে শোনে কার কথা! হাটুরে মার যখন শুরু হয় তখন তাকে ঠেকানো ভারী শক্ত। বটুও ঠেকানোর কোনও চেষ্টা করল না। খানিক পর বারান্দার নীচে উঠোনে গড়িয়ে পড়ে গেল। কষ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, চোখ উলটে গিয়েছে, মুখে-চোখে রক্তাভা। দড়ি দিয়ে অচৈতন্য বটুকে বারান্দার থামের সঙ্গে ঠেস দিয়ে বেঁধে রাখা হল। লোকজন ঘিরে রইল পাহারায়।

একটু বেলার দিকে সেপাই নিয়ে যতীন দারোগা এলেন। সব শুনলেন মন দিয়ে। তারপর বটুকে গ্রেফতার করে নিয়ে চলে গেলেন।

সাত

বটু সর্দার বিদেয় হওয়ায় রায়বাড়ি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। জোর একটা ফাড়া কেটে গিয়েছে। নইলে যে কী সর্বনাশ হয়ে যেত কে জানে! শশীমুখীর সাহসেরও বেশ প্রশংসা হল চারদিকে। শুধু দু'জন লোকই এই ঘটনায় তেমন খুশি নয়। একজন গুরুপদ। সে বেশি কথা-টথা বলে না, চুপচাপ খেয়ে উঠে গিয়ে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকে। আর একজন বিজয়বাবু। তিনি মাঝে-মাঝেই বলেন, "লোকটাকে যতটা খারাপ বলে ভাবা হচ্ছে, ততটা বোধ হয় নয়। কোথাও একটা ভুল হচ্ছে আমাদের।"

যাই হোক, তিন-চারদিন পরে একদিন সকালে হঠাৎ একটা পেল্লায় কালো রঙের ঝাঁ-চকচকে গাড়ি এসে রায়বাড়ির সামনে থামল। তা থেকে নেমে এলেন লালমুখো এক লম্বা-চওড়া সাহেব। সঙ্গে এক আরদালি গোছের লোক।

"এখানে বিজয়পদ রায় বলে কেউ আছেন?"

সাহেব হাত বাড়িয়ে বিজয়বাবুর হাত চেপে ধরে একটা ঝাকুনি দিয়ে বললেন, "আমার নাম লু আর্চার। আমি একটা খবর পেয়েই আপনার কাছে এসেছি। যদি একটু সময় দেন!"

সাহেব একটা প্রকাণ্ড অ্যাটাচিকেস সামনের টেবিলে রেখে বসলেন। তারপর বললেন, "আপনি বোধ হয় আমার ঠাকুরদা নাথান আর্চারের নাম শুনে থাকবেন। তিনি আর্ছাপুর নামে একটা জায়গায় থাকতেন। আসলে জায়গাটার নাম হয়েছিল আমার এক পূর্বপুরুষ জন আর্চারের নামে। আগে 'আর্চারপুর' বলা হত। পরে লোকের মুখে-মুখে হয়ে দাঁড়ায় আছাপুর'। এখন আর সেই নামটাও নেই। এখন জায়গাটার নাম 'গোপালহাটি।"

বিজয়বাবু বললেন, "আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। নাথান আর্চার আমার ঠাকুরদার বন্ধু ছিলেন।"

"জন আর্চারের কাছে একটি খুব দুপ্রাপ্য বই ছিল। একটা হিব্রু ভাষার বাইবেল। আমাদের যতদূর জানা আছে, নাথান আর্চারের কাছেও বাইবেলটা ছিল। তারপর বাইবেলটা কোথায় গেল তার আর খোঁজ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমি একটা উড়োখবর পেয়েছিলাম যে, বাইবেলটা এই অঞ্চলেই কারও কাছে এখনও আছে। বইটার বিশেষত্ব হল, জন আর্চার ওটিকে কোথাও একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে যান। তাই প্রায় চারশো বছরের পুরনো বইটা হয়তো এখনও অক্ষত আছে। একজন বড় শিল্পীর হাতে লেখা আগাগোড়া ক্যালিগ্রাফি করা বইটার আর্থিক ভ্যালু এখন সাংঘাতিক। আমি তাই এই বইটার হদিশ পাওয়ার জন্য একজন লোককে কাজে লাগাই। তার সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল, বইটার খোঁজ দিতে পারলে তাকে আমি মোটা টাকা দেব। মাত্র কিছুদিন আগে সে আমাকে বইটার সন্ধান দিয়েছে।"

বিজয়বাবু সবিস্ময়ে বললেন, “আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। বইটা আমার কাছেই আছে। আপনি নিয়ে যেতে পারেন।”

লু আর্চার একটু হেসে বললেন, “বইটা কি আপনি আমাকে বিনা পয়সায় দেবেন?”

“নিশ্চয়ই। ওই বই তো আমার কাজে লাগে না। আমি হিব্রু ভাষা জানি না।”

“ভাল করে ভেবে দেখুন মিস্টার রায়। বইটা যদি এখন সদেবি বা ক্রিস্টির নিলামে ওঠে তা হলে ওর দাম এখন কয়েক কোটি টাকা পর্যন্ত উঠতে পারে। ভ্যাটিকান বা অন্যান্য চার্চ এই বাইবেলটির জন্য যে-কোনও মূল্য দিতে রাজি। সুতরাং আপনি দিলেও আমি বইটা বিনামূল্যে নিতে রাজি নই। তবে আমি আপনাকে তত বেশিও দিতে পারব না। আমি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা নিয়ে এসেছি।”

বিজয়বাবুর প্রায় ভিরমি খাওয়ার জোগাড়! লু আর্চার অ্যাটাচিকেসটা খুলতে খুলতে বললেন, “আর যে লোকটা এই বাইবেলের সন্ধান আমাকে দিয়েছে, সেই বটু সর্দারকে দশ লক্ষ টাকা।”

বাড়ির সবাই পিছনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। কে একজন বলে উঠল,“বটু তো চোর!”

বাংলা কথাটা বুঝতে সাহেবের একটু সময় লাগল। বিজয়বাবু ইংরেজি করে বুঝিয়ে দেওয়ার পর সাহেব একটু ভ্রু-কুঞ্চন করে বললেন, “বটু সর্দার চোর? এটা কি রসিকতা নাকি? বটু সর্দার যদি চোরই হবে, তা হলে সে তো বাইবেলটা অনেক আগেই নিয়ে গিয়ে আমাকে সরাসরি বিক্রি করে দিতে পারত। কারণ, বাইবেলটার দাম তার ভালই জানা ছিল। সে তো তা করেইনি, উপরন্তু পাছে বাইবেলটা কেউ হাতিয়ে নেয়, তার জন্য সে এই বাড়িতে থেকে সেটা পাহারা দিয়েছে।”

বিজয়বাবু স্খলিত কণ্ঠে বললেন, “বটু সর্দার এখন পুলিশের হেফাজতে।”

লু আর্চার বললেন, “সেটা আমি শুনেছি। তার অপরাধ কী জানি না। সেটা আপনারাই ভাল জানবেন। কিন্তু কয়েকদিন আগেই সে আমাকে জানিয়েছে, বাইবেলের দাম পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাবে আপনাদের পরিবার, কিন্তু বটু সর্দারের ভাগের দশ লক্ষ টাকা পাবে আপনাদের ছোটভাই গুরুপদ রায়।”

সবাই প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, “গুরুপদ?”

সাহেব বললেন, “হ্যাঁ। গুরুপদ রায়ের নাকি একটা মোটরবাইকের শখ। আর বাকি টাকা দিয়ে সে একটা দোকান দেবে। গুরুপদ রায় বটু সর্দারকে অসময়ে তাদের বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ায় বটু সর্দার তার কাছে কৃতজ্ঞ।”

পিছনে ভিড়ের মধ্যে একটা ফোঁপানির শব্দ পাওয়া গেল। শশীমুখী কাঁদছেন।

সাহেব একটা শ্বাস ফেলে বললেন, “মিস্টার রায়, তা হলে এবার দয়া করে টাকাটা গুনে নিয়ে আমাকে এই রসিদে সই করে দিন, আর বাইবেলটা নিয়ে আসুন।”

"মিস্টার আর্চার, আর-একটা কথা। বাইবেলটার মধ্যে একটা গুপ্তধনের নকশা ছিল।"

লু আর্চার হাসলেন, "হ্যাঁ, বটু সর্দার অনেক আগেই নকশাটা আমাকে দেখিয়েছে। আমার মনে হয়, ওটা একটা ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়। জন আর্চার তার সব টাকাপয়সা ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে তার গুপ্তধন থাকার কথা নয়। লোভী মানুষের মনোযোগ বাইবেল থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যই তিনি ওই নকশা বাইবেলে ঢুকিয়ে রাখেন। অন্তত আমার তাই ধারণা।"

লু আর্চার বাইবেল নিয়ে চলে যাওয়ার পর বাড়িতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাওয়ার আনন্দের কোনও হইচই উঠল না। কারও মুখে হাসি বা খুশির চিহ্নমাত্র ফুটে উঠতে দেখা গেল না। গুরুপদকে যখন দশ লক্ষ টাকার খবর দেওয়া হল, তখন সে নিজের বিছানায় বালিশে মুখ গুজে শুয়ে ছিল। খবরটা শুনে ওই অবস্থাতেই মুখ না তুলে বলল, "ও টাকা তোমরাই নাও গে, আমার দরকার নেই!"

শশীমুখী হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে অজয়পদকে ধরে পড়লেন, "যেমন করে পারো ওই হতভাগা বটু সর্দারকে ছাড়িয়ে আনো। নইলে আমি অন্নজল ত্যাগ করব, তা বলে রাখছি।"

পরদিন সকালেই পাঁচভাই আর গাঁয়ের মেলা রোকজন থানায় গিয়ে হাজির। ছোট গরাদের মধ্যে বটু তখন কম্বলমুড়ি দিয়ে বসা। লোকজন দেখে তটস্থ হয়ে জুলজুল করে চেয়ে রইল।

অজয়পদ বললেন,"ও বটু, আমরা তোমাকে ছাড়িয়ে নিকে এসেছি।"

বটু গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলল, "না মশাই, এই বেশ আছি! মাথার উপর ছাদ আছে, কম্বল জুটেছে, দু'বেলা খ্যাটনের ব্যবস্থা আছে। আর চাই কী?"

"তা বললে তো হবে না বটু! আমাদের উপর হুকুম হয়েছে, তোমাকে আমাদের বাড়িতেই নিয়ে যেতে হবে।"

বটু ফের জুলজুল করে চেয়ে মাথা নেড়ে বলল, "না মশাই, ওরা বড় মারে।"

কথাটা এমনভাবে বলল বটু যে, গায়ের যেসব লোকজন এসেছিল, তারা অনেকে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল। "আর কখনও তোমাকে মারব না… আর আমাদের ভুল হবে না...এবারকার মতো আমাদের মাপ করে দাও বটু সর্দার... তুমি জিলিপি ভালবাসো, আমরা রোজ তোমাকে জিলিপি খাওয়াব... নতুন জুতো কিনে দেব…!"

অজয়পদ চোখের জল মুছে বললেন, "তোমাকে বুঝতে ভুল হয়েছিল বাপু! তা পাপের একটা প্রায়শ্চিত্তও তো আছে! নইলে যে আমাদের দগ্ধে মরতে হবে!"

রাত্রিবেলা নতুন নরম বিছানায় নতুন মশারি খাটিয়ে দিতে দিতে শশীমুখী বললেন, "তুমি ভাল লোক না মন্দ লোক তা আজও বুঝে উঠতে পারিনি। যতদিন সেটা ঠিকমতো বুঝতে না পারছি, ততদিন এ বাড়ি থেকে বিদেয় হওয়ার চেষ্টা করলে তোমার ঠ্যাং ভেঙে দেব।"

মশারির ভিতর থেকে জুলজুল চোখে চেয়ে বটু বলল,"আমাকে অত বিশ্বাস করবেন না মাঠান ! আমি বড় গোলমেলে লোক!"

"সেটা হাড়ে-হাড়ে জানি। সেই গোলমালটা না ধরতে পারা পর্যন্ত আমার কাছেই থাকতে হবে তোমাকে।"

"উটকো লোক আমি মাঠান! উটকো লোককে ঠাই দেওয়া কি ভাল?"

"উটকো আবার কী? ছেলেবেলায় আমার বাবা মারা যান, তাকে আমার মনেও নেই। উটকো লোক হবে কেন, তুমি আমার বাবা হয়ে এ বাড়িতে থাকবে!"